

কর্ম/নির্বাণ

(গল্পে বৌদ্ধধর্ম)

পল ক্যরুস



অনুবাদক:

অধ্যক্ষ বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য



কল্পতরু ধর্মীয় বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠান বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকোনো এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি মুক্তিকামী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

କର୍ମ

ଏକଟି ବୋକ୍ସ ବୀଠିକଥା

বিদর্শନ শিক্ষା কেন্দ্র গ্রন্থমালা — ৩

কর্ম / নির্বাণ

পল কার্লস

অনুবাদক

অধ্যক্ষ শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্র

১২, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা-৭০০ ০০১

KARMA / NIRVANA

by

Paul Carus

Translated by :

Principal Bishnupada Bhattacharya

**Translated and published with the permission of
Open Court Publishing Company, La Salle, Illinois, U.S.A.**

আম্বিনী পুঁথিমা, ১৩০৮

প্রকাশক :

ডক্টর স্বকোমল চৌধুরী

বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্র

১২, ম্যাডো লেন

কলিকাতা-৭০০ ০০১

সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত

মূল্য : ট.ক. ,

মুদ্রক :

‘পলি প্রিন্ট’

১১৭/১, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রিট

কলিকাতা-১২

মূচোপত্র

প্রকাশকের নিবেদন, পাঁচ

অগ্নীয় বরদা রঞ্জন

বড়ুয়া, সাত

কর্ম, ১

নির্বাণ, ৪১

প্রকাশকের নিবেদন

বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ পল ক্যারস বিরচিত ‘কর্ম / নির্বাণ’ শীর্ষক ইংরেজী গ্রন্থের সর্বপ্রথম বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হ’ল। অনুবাদ করেছেন কলিকাতা গভর্ণমেন্ট সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য। প্রকাশিত গ্রন্থখানি দু’টো গ্রন্থের সমন্বয়—একটি ‘কর্ম’ অপরটি ‘নির্বাণ’। বৌদ্ধধর্মের মূল প্রতিপাদ্য যে দু’টো বিষয় কর্ম এবং নির্বাণ—তা নিয়েই এই গ্রন্থের অবতারণা। মূল গ্রন্থকার পল ক্যারস বৌদ্ধশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। অতি সুন্দরভাবে গল্পের মাধ্যমে তিনি কর্ম ও নির্বাণের ব্যাখ্যা করেছেন প্রাঞ্জলভাষায়। তাঁর এই অভিনব প্রচেষ্টা সর্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। জটিল দর্শনতত্ত্বকে সহজ সরলভাবে গল্পের মাধ্যমে প্রকাশ করা একমাত্র তাঁর মতো বিদগ্ধ পণ্ডিতের পক্ষেই সম্ভব। লিও টলষ্টয় ‘কর্ম’ অংশের অনুবাদ করেছেন রুশ ভাষায় ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে। টলষ্টয় সগর্বে বলেছেন—“I should be very happy were I the author of ‘Karma’..... It is one of the best products of national wisdom, and ought to be bequeathed to all mankind” ‘কর্ম’ অংশটি যখন সর্বপ্রথম “The Open Court” পত্রিকায় (The Open Court Publishing Company, La Salle, Illinois) প্রকাশিত হয়, সারা বিশ্বে দারুণ সারা পড়ে যায়। চারদিক থেকে বিভিন্ন ভাষায় এর অনুবাদের আবেদন আসে। আশ্চর্যের বিষয় ২ বছরের মধ্যে (উনবিংশ শতাব্দী শেষ না হতেই) এর তিনটি সংস্করণ হয় জার্মান ভাষায়, দুটি ফরাসী ভাষায়, একটি জাপানী ভাষায়, একটি উর্দু ভাষায়, একটি রুশ ভাষায় (অনুবাদক লিও টলষ্টয়), একটি হাঙ্গেরীয় ভাষায়, একটি আইসল্যান্ডীয় ভাষায় এবং কয়েকটি এশীয় ভাষায়। সর্বপ্রথম চিত্র-সম্বলিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় জাপান থেকে। চিত্রাঙ্কণ করেছেন প্রসিদ্ধ জাপানী শিল্পী Kwasong Suzuki. ১৯৭৩ খৃষ্টাব্দে ‘কর্ম’ এবং ‘নির্বাণ’কে একই গ্রন্থে প্রকাশিত করেছেন Open Court Publishing Company. উক্ত সংস্থা গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশের জন্য অনুমতি প্রদান করে আমাদের কৃতজ্ঞতাশে আবদ্ধ করেছেন। অনুবাদক বিদ্বজ্জনবরেণ্য অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য মহোদয়ের নিকটও আমরা চিরঞ্চনী—কারণ উক্ত দুই গ্রন্থের প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ

করে তিনি আমাদের প্রকাশের সুযোগ করে দিয়েছেন। আমাদের বর্তমান প্রকাশিত গ্রন্থে Kwasong Suzuki অঙ্কিত ছবিগুলোই পুনর্মুদ্রিত করা হয়েছে। ১৯৭৩ খৃষ্টাব্দের সংস্করণে প্রকাশিত ‘কর্ম’ অংশের ছবিগুলোর সংস্কার করেছেন Eduard Biedermann. আমাদের বর্তমান সংস্করণে কিছু কিছু ছবির পুনঃসংস্কার করেছেন শ্রীম্মথেন গুপ্ত এবং শ্রীদীপঙ্কর বড়ুয়া। তাঁরা সকলেই আমাদের ধন্যবাদার্থ। প্রেসের উপযোগী করে মূল পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি তৈরী করে দিয়েছেন এবং কিছু কিছু প্রফ সংশোধন করে দিয়েছেন গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের স্নাতকোত্তর গবেষণা ও প্রকাশন-বিভাগের Editor পণ্ডিত শ্রীননীগোপাল তর্কতীর্থ মহোদয়। তাঁর কাছেও আমরা চিরকৃতজ্ঞ।

স্বর্গীয় বরদারঞ্জন বড়ুয়া মহোদয়ের পুণ্যস্মৃতি রক্ষার্থে তদীয় সহধর্মিণী শ্রীমতী ইন্দুপ্রভা বড়ুয়া এবং একমাত্র কন্যা শ্রীমতী অরুণা বড়ুয়া এই গ্রন্থ প্রকাশের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করেছেন। ভগবান বুদ্ধ বলেছেন— ‘ধম্মদানং সর্বদানং জিনাতি’ অর্থাৎ ধর্মদানই সকল দানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই গ্রন্থ পাঠ করে পাঠকমাত্রই ধর্মবিষয়ে উদ্বুদ্ধ হবেন এতে কোন সন্দেহ নেই। অতএব, এই ধর্মদানের জন্তু শ্রীমতী ইন্দুপ্রভা বড়ুয়া এবং শ্রীমতী অরুণা বড়ুয়া শুধু আমাদের নয়, সমগ্র পাঠকসমাজেরই ধন্যবাদার্থ হয়েছেন। তাঁদের এই ধর্মদানের ফল লাভ করে স্বর্গীয় বরদাবাবু নির্বাণস্থখে স্থখী হোন—এটাই আমাদের প্রার্থনা।

পরিশেষে ধন্যবাদ জানানাই পলি প্রিন্টের স্বত্বাধিকারিগণ ও কমিগণকে যারা মাত্র অল্প সময়ে গ্রন্থখানির মুদ্রণ ব্যাপারে আমাদের সঙ্গে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছেন।

ভবতু সর্বমঙ্গলং।

শ্রীম্মকোমল চৌধুরী

ঈর্ষ্য বরদা রঞ্জন বড়ুয়া মহোদয়ের পুণ্যস্মৃতি রক্ষার্থে
তদীয় পত্নী শ্রীমতী ইন্দুপ্রভা বড়ুয়া এবং কন্যা শ্রীমতী
অরুণা বড়ুয়া (২৪ পরগণার অশোক নগর অঞ্চলের
লব্ধপ্রতিষ্ঠিত ডাক্তার শ্রীহৃদর্শন বড়ুয়ার সহধর্মিণী)-র
অর্থানুকূলে এই গ্রন্থ প্রকাশিত।



বিদর্শন-আদক বরদা বসন্ত বড়ুয়া

(১৯০৪—১৯৮০)

ଏବଂ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ବଞ୍ଚିବେ

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রামের তুলাবাড়িয়া গ্রামে তাঁর জন্ম। ১৯৮০ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারী ২৪-পরগণার অশোকনগর হাসপাতালে সজ্জানে তাঁর মরদেহ ত্যাগ। শৈশবেই পিতৃমাতৃহীন তিনি ছিলেন সাত ভাই-এর মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। তাই বড় ভাইদের কাছে তিনি ছিলেন অত্যন্ত আদরের। মাত্র ১৪ বছর বয়সে তিনি ম্যাট্রিক পরীক্ষা না দিয়ে পাড়ি দিলেন রেজুনে। রেজুনে মঞ্জীন্দ্রনাথ ঘোষাল নাম জনৈক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির সহায়তায় তিনি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হন। এরপর ধীরে ধীরে তিনি পুস্তক ব্যবসায় লিপ্ত হন রেজুনেই এবং কয়েক বছরের মধ্যেই যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে তিনি বার্মায় ৬টি বই-এর দোকানের মালিক হন—৪টি রেজুনে এবং ২টি ম্যানডেলি সহরে। সমগ্র ব্রহ্মদেশে তাঁর মত বড় পুস্তক ব্যবসায়ী খুব কম ছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। কার্ঘ্যব্যপদেশে তখন তিনি এসছিলেন কোলকাতায়। যুদ্ধের কারণে তখন বার্মায় ফিরে যেতে পারেননি। কিন্তু কোলকাতায়ও তিনি বসে ছিলেন না। কর্মযোগী মানুষেরা কখনও বসে থেকে সময় কাটাতে পারেন না। তিনি কোলকাতার বিবেকানন্দ রোড ও বিধান সরণীর সংযোগস্থলে “সান্ডুভেলী রেইক্রেট” খুলে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। যুদ্ধের পরে তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রদের উপর রেইক্রেটের পরিচালনভার হস্ত করে পুনরায় বার্মায় চলে যান। কিন্তু তাঁর পূর্বোক্ত ৬টি দোকানের মধ্যে কিছুই তখন আর অবশিষ্ট ছিল না। এতে কিন্তু বরদাবাবু একটুও ভেঙে পড়লেন না। সবই ‘কর্মফল’ স্বরূপ মেনে নিয়ে তিনি নতুন উত্তম সহকারে পুনরায় ব্যবসা শুরু করলেন। রেজুনের ফ্রেজার ষ্ট্রিট এবং লুইস ষ্ট্রিটের সংযোগস্থলে Burma News Agency শীর্ষক প্রকাণ্ড দোকান ছিল তাঁরই। শেষের দিকে তিনি অনেক মূল্যবান গ্রন্থের প্রকাশকরূপেও যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কিন্তু ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে তিনি আবার নতুন বিপর্ষয়ের সম্মুখীন হলেন। ব্রহ্মদেশের সরকার ঘোষণাবলে সমস্ত ব্যবসাপত্র জাতীয়করণ করলেন। শেষ জীবনের এই আঘাত অসহনীয় হলেও তিনি ‘কর্মফল’ স্বীকার করে হাসিমুখে কোলকাতায় ফিরে এলেন। এবং দমদম নাগের বাজারে নিজস্ব বাড়ী তৈরী করে

[আট]

শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করতে শুরু করলেন। অধিকাংশ সময় তিনি 'বিদর্শন ভাবনা' করেই কাটিয়ে দিতেন। তিনি আমরণ আমাদের “বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্রে”র ধ্যানশিক্ষক নিযুক্ত থেকে অনেকের যথেষ্ট উপকার সাধন করেছেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বরদাবাবুর অকাতরে দানের কথাও সর্বজনবিদিত। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে শুধু আমাদেরই নয়, সমগ্র বাঙালি বৌদ্ধ সমাজেরই অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে।

স্বর্গীয় বরদাবাবুর একমাত্র কন্যা শ্রীমতী অরুণা বড়ুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। ডাক্তার শ্রী সুদর্শন বড়ুয়ার (বর্তমানে ২৪ পরগণার অশোকনগর অঞ্চলের লক্ষপ্রতিষ্ঠা চিকিৎসক) সঙ্গে একমাত্র মেয়ের বিবাহ দিয়ে বরদাবাবু মেয়ে-জামাই উভয়কে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য বিলাত পাঠিয়েছিলেন।

বরদাবাবু বিদর্শন ভাবনাতে যথেষ্ট অগ্রসর হয়েছিলেন এবং ব্রহ্মদেশের বিখ্যাত তেজগুপ্ত সেয়াড-কর্তৃক প্রদত্ত বিদর্শন ভাবনা সম্বলিত কয়েকটি ভাষণের বঙ্গানুবাদ তিনি করে রেখে গেছেন। আমরা তাঁর সেই বঙ্গানুবাদ এর পরেই প্রকাশিত করবো। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করি।

শ্রীপ্রজ্ঞাজ্যোতি মহানুভবির

দভাপতি,

বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্র

দেবালের চাল বোঝাই গাড়ী

সে অনেক দিনের আগের কথা। তখন বৌদ্ধধর্মের প্রচার সবে মাত্র শুরু হয়েছে। ভারতবর্ষে তখন সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্যের যুগ। এদেশের আর্য অধিবাসীরা ছিল খুবই উন্নত ও সুসভ্য। আর সে সময়ের বড় বড় নগর ছিল শিল্প, বাণিজ্য ও শিক্ষার এক একটি কেন্দ্র।

সেই প্রাচীন যুগে পাণ্ডু নামে এক ধনী ব্রাহ্মণ রত্নকার শ্রেষ্ঠী একটি শকটে করে বারাণসীর দিকে যাচ্ছিলেন। তাঁর ঝাঁক ছিল লাভজনক লেনদেনের ব্যবসার দিকে। আর তাঁর সঙ্গে ছিল এক ভৃত্য, যে তাঁর ঘোড়াগুলির পরিচর্যা করত।

দেখে মনে হচ্ছিল যেন সেই শ্রেষ্ঠীর গন্তব্য স্থানে পৌঁছবার জন্য খুব তাড়া। আর দিনটিও ছিল খুব মনোরম, কেন না কিছুকাল আগেই বেশ বড় রকম ঝড় বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার ফলে আবহাওয়া ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। ঘোড়াগুলোও বেশ জোর কদমেই এগিয়ে চলেছিল।

পথে যেতে যেতে তারা এক বৌদ্ধ শ্রমণের দেখা পেল। শ্রেষ্ঠী তাঁর মহিমান্বিত আকৃতি দেখে আপন মনে ভাবতে লাগল— “শ্রমণকে দেখে বেশ পুতচরিত্র ও সাধুপ্রকৃতি বলে মনে হচ্ছে। সজ্জনসঙ্গ সৌভাগ্যের কারণ। যদি তিনিও বারাণসীর দিকেই যান ত’ আমি তাঁকে আমার গাড়ীতে ওঠার জন্য অনুরোধ করব।”

বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে অভিবাদন করবার পর শ্রেষ্ঠী তাঁকে জানানেন যে তিনি বারাণসীর দিকে যাচ্ছেন এবং সেখানে কোন সরাইখানায়



তিনি থাকবেন তাও তাঁকে বললেন। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীটির নাম ছিল নারদ। যখন পাণ্ডু জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন যে তিনি বারাণসীতেই যাচ্ছেন, তখন তিনি নারদকে তাঁর গাড়ীতে উঠে বসবার জন্ত অনুরোধ করলেন। সন্ন্যাসী বললেন, “আপনার এই অনুগ্রহের জন্ত আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমি সত্যই এই দীর্ঘপথ চলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। কিন্তু আমার নিজের বলে ত’ কিছুই নেই। তাই আমি আপনাকে এর বদলে কিছু দিতে পারব না। তবে হয়ত’ এমন হতে পারে যে আপনাকে আমি কিছু

আধ্যাত্মিক সম্পদ দিতে পারব, যে সম্পদ শাক্যমুনির বাণী থেকে তাঁকে অনুসরণ ক'রে আমি লাভ ক'রেছি। তিনিই ভগবান, বুদ্ধ, দেব ও মানবের শাস্তা।”

তখন তাঁরা একই সঙ্গে সেই গাড়ীতে চেপে চলতে লাগলেন। আর পাণ্ডুও গভীর মনোযোগ দিয়ে সেই বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর কথাবার্তা শুনতে লাগলেন। এই ভাবে ঘটানেক কাটবার পর তাঁরা এক জায়গায় উপস্থিত হয়ে দেখেন যে সামনের দিকে গাড়ী নিয়ে এগিয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব, কেননা কিছুকাল আগে যে বৃষ্টি হয়ে গেছে তার ফলে পথের একটা অংশ ধ্বসে গেছে, আর সেই-খানেই চালের বস্তা বোঝাই এক গাড়ী পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে। একটা চাকা গাড়ী থেকে বেরিয়ে চলে যাওয়ায় দেবল, যে ছিল গাড়ীর মালিক, খুব ব্যস্ত ভাবে সেটি সারাবার জন্তে উঠে পড়ে লেগেছিল। সেও তার চাল বেচবার জন্তে বারাণসীতেই যাচ্ছিল এবং পরদিন ভোর হবার আগেই যাতে সে শহরে পৌঁছতে পারে, তার জন্তে তার খুব তাড়া ছিল। যদি তার সেখানে পৌঁছতে দু'একদিন দেরী হয়ে যায়, তবে হয়ত চালের ব্যাপারীরা তাদের প্রয়োজন মত চাল কিনে শহর ছেড়ে চলেও যেতে পারে।

যখন শ্রেষ্ঠী দেখলেন যে চাষীর চাল বোঝাই গাড়ীটি সামনে থেকে সরান না হলে তাঁর পক্ষে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, তখন তিনি ক্রমশঃ রেগে উঠতে লাগলেন। মহাদূত নামে তাঁর সঙ্গে যে চাকরটি ছিল, তিনি তাকে ডেকে চালের গাড়ীটিকে রাস্তার একধারে সড়িয়ে দেবার জন্তে বললেন, যাতে তাঁর গাড়ীটি এগিয়ে যেতে পারে। চাষীটি এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে লাগল, কেননা পথের একদিকটা ছিল খুবই ঢালু, আর সেদিকে তার গাড়ী ঠেলে সরিয়ে দিলে, গাড়ী বোঝাই চাল নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা। কিন্তু ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠীটি তার কথায় কিছুমাত্র কান না দিয়ে, তাঁর চাকরকে গাড়ীটিকে উলটে ফেলে একধারে সরিয়ে দেবার জন্ত

আদেশ করলেন। মহাদূতের গায়ে ছিল অসম্ভব শক্তি আর পরকে আঘাত করে বোধ হয় তার আনন্দ হত। তাই বৌদ্ধ শ্রমণ তাকে বারণ করবার আগেই সে তার প্রভুর আদেশ মত কাজ করল। গাড়ী বোঝাই সব চাল গেল পথের ধারে ছড়িয়ে, যার ফলে চাষীর অবস্থা আগের থেকে খারাপই হল।

বেচারা চাষীটি খুব চেষ্টামেচি করতে লাগল বটে কিন্তু মহাদূত তার বিরাট শরীর নিয়ে ঘুঁসি উচিয়ে যখন তাকে শাসাতে লাগল, তখন তার চেষ্টামেচি গালমন্দ সব ধেমো গেল। সে শুধু নিষ্ফল আক্রোশে মনে মনে গজরাতে লাগল আর নীচু গলায় অভিশাপ দিতে লাগল।

এর পর পাণ্ডু যখন আবার গন্তব্য স্থল অভিমুখে যাত্রা করতে যাবেন, সেই সময় কিন্তু শ্রমণ তাঁর গাড়ী থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়লেন এবং বললেন, “মহাশয়। আপনাকে মাঝপথে ছেড়ে যাচ্ছি বলে আমাকে ক্ষমা করবেন। এক ঘণ্টাকাল যে আপনি আমাকে আপনার গাড়ীতে বসে যাবার সুযোগ দিয়েছেন, সে জগৎ আপনার অনুগ্রহের প্রতি আমার গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই। আপনি যখন পথের মধ্যে আমাকে গাড়ীতে তুলে নেন, তখন আমি ভারী ক্লান্ত ছিলাম। কিন্তু আপনার এই সৌজন্মের ফলে আমার শ্রম দূর হয়েছে। আমি গরীব চাষীটিকে দেখে চিনতে পারলাম যে পূর্বজন্মে সে ছিল আপনারই এক পূর্বপুরুষ। সুতরাং তার এই বিপদে যদি আমি সাহায্য করতে পারি, তবে আমার প্রতি আপনার দয়ার তার থেকে সমুচিত প্রতিদান আর কিই বা হতে পারে।”

ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠীটি এই কথা শুনে শ্রমণের মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে বললেন—“কি বললেন? আমার এক পূর্বপুরুষ এই জন্মে এই চাষী হয়ে জন্মেছেন? এ কখনও হতে পারে না।”

শ্রমণ শান্তভাবে বললেন—“আমি জানি যে আপনার সঙ্গে এই চাষীর অদৃষ্ট যে সব সূক্ষ্ম সম্বন্ধের সূত্রে বাঁধা, সে সম্বন্ধে আপনি

সম্পূর্ণ অন্ধ। কিন্তু দেখতে পাওয়া যায় অতিশয় বুদ্ধিমান্ বিচক্ষণ লোকও কখনও কখনও আধ্যাত্মিক দিক্ দিয়ে সম্পূর্ণ অন্ধ। সুতরাং আমার দুঃখ হচ্ছে এই জগ্গে যে আপনি আপনার নিজের স্বার্থেরই ক্ষতি করছেন। অতএব আপনি নিজেই যেভাবে নিজেকে আঘাত করার জগ্গে উদ্বৃত হয়েছেন, তা থেকে আপনাকে রক্ষা করা হবে আমার লক্ষ্য।”

ধনী শ্রেণী কখনও অন্য কারোর কাজ থেকেই এরকম ভৎসনা শোনেন নি। তিনি বুঝতে পারলেন শ্রমণের কথা, তা যতই করুণার সঙ্গে উচ্চারিত হ'ক না কেন, তার মধ্যে তীব্র ভৎসনা প্রচ্ছন্ন রয়েছে। তাই তিনি আর কালক্ষেপ না ক'রে তাঁর ভৃত্যকে উদ্দেশ করে গাড়ী চালাতে বল্লেন।

রত্নকারের টাকার খলি

শ্রমণ দেবল নামে সেই কৃষকটিকে অভিবাদন ক'রে তার গাড়ীটি সারাবার জন্ত তাকে সাহায্য করবার জন্ত এগিয়ে গেলেন। এবং চারদিকে যে চাল ছড়িয়ে পড়ে ছিল, তা গাড়ীতে তুলে দিতে



লাগলেন। এইভাবে ছ'জনের চেষ্টায় কাজ বেশ তাড়াতাড়িই সারা হতে লাগল। দেবল তখন মনে মনে চিন্তা করতে লাগল—

“নিশ্চয় এই শ্রমণটি একজন পুণ্যাত্মা ধার্মিক সাধু। মনে হয় দেবতার। অদৃশ্য হ'য়ে তাঁকে সাহায্য করছেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করব কি কারণে আমি এই গর্বিত ব্রাহ্মণের হাতে এইভাবে নিগৃহীত হলাম।” তারপর সে শ্রমণকে উদ্দেশ্য করে বলল—
“মহাশয়, আপনি কি বলতে পারেন কি কারণে আমি একজনের কাছে এইরূপ অশ্রদ্ধা আচরণ পেলাম, যদিও আমি তার কোন ক্ষতিই করিনি?”

শ্রমণ তখন বললেন—“হে বন্ধু, তুমি যে কিছু অশ্রদ্ধা ভাবে কষ্ট ভোগ করছ, তা' নয়। কিন্তু পূর্বজন্মে তুমি ঐ রক্তকারের প্রতি যে আচরণ ক'রেছিলে, ইহজন্মে তুমি সেই একই রকম তার কাছ থেকে পাচ্ছ। তুমি যে বীজ বপন করেছিলে, তদনুরূপ ফল তুমি পাচ্ছ। তোমার অদৃষ্ট তোমার কৃত কর্মেরই পরিণাম মাত্র। তোমার বর্তমান অস্তিত্বের মূলে আছে, বিভিন্ন অতীত জন্মে অনুষ্ঠিত তোমার কর্ম।”

“কি আমার কর্ম?” কৃষকটি প্রশ্ন করল।

শ্রমণ উত্তর দিলেন—“পুরুষের কর্ম বলতে বোঝায় বর্তমান জন্মে এবং পূর্ববর্তী কোনও জন্মে তার অনুষ্ঠিত শুভ বা অশুভ সকল প্রকার কাজের সমষ্টি। তোমার জীবন নানা কাজের সমষ্টিমাত্র, যা' স্বাভাবিক ভাবেই ক্রম বিবর্তনের নিয়ম অনুসারে গড়ে ওঠে, এবং যা একপুরুষ থেকে আর এক পুরুষে সংক্রামিত হয়ে থাকে। আমাদের প্রত্যেকের সমগ্র সত্তা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত নানাবিধ প্রবৃত্তিরই সমষ্টিমাত্র, যার সঙ্গে নতুন অভিজ্ঞতা ও কর্ম যুক্ত হয়ে তাকে নতুন রূপ দেয়। এই ভাবে আমরা যা করেছি, আমরা তাই। আমাদের কর্মই আমাদের প্রকৃতির নিয়ামক। আমরাই আমাদের স্রষ্টা।”

দেবল উত্তর দিল—“আপনি যা বলছেন, হয়ত তাই ঠিক। কিন্তু ঐ গর্বিত ব্রাহ্মণটির সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি বলতে পারেন?”

তখন শ্রমণ বললেন—“চারত্রের দিক দিয়ে তোমার সঙ্গে ব্রাহ্মণের অনেক মিল আছে। এবং যে কর্ম তোমার ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রিত করেছে, তার সঙ্গে ব্রাহ্মণের কর্মের তফাৎ খুবই কম। আমি যদি তোমার মনের ভাব বুঝতে ভুল না করে থাকি, তবে আমি একথা জোর দিয়ে বলতে পারি যে যদি সেই শ্রেষ্ঠীটি তোমার জায়গায় থাকত, তবে আজও তুমি তার প্রতি একই রকম ব্যবহার করতে, বিশেষ করে যদি তার মত আজ্ঞাবহ জোয়ান ভৃত্য তোমার পাশে থাকত, এবং সে যদি তার খুশীমত তোমার সঙ্গে ব্যবহার করতে পারত।”

কৃষকটি তখন অকপটে স্বীকার করলে যে, যদি তার শক্তি থাকত তবে কোন লোক তার পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে থাকলে ব্রাহ্মণটি তার প্রতি যে রকম ব্যবহার করেছিল, সেই একই রকম ব্যবহার সেই লোকটির প্রতি করতে তার কোন সঙ্কোচ হত না বটে। কিন্তু নির্ভুর আচরণের জন্তে যে শাস্তি পেতে হয়, সে কথা মনে রেখে সে স্থির করেছে যে ভবিষ্যতে ভাল করে বিবেচনা করে তবে সে অন্য লোকের সঙ্গে ব্যবহার করবে।

গাড়ীতে সব চাল বোঝাই হবার পর তারা দু'জনে আবার বারাণসী অভিমুখে যাত্রা করল। হঠাৎ এক সময় পথের মাঝখানে ঘোড়াটি লাফিয়ে সরে গেল। কৃষকটি “সাপ, সাপ” বলে জোর গলায় চৈচিয়ে উঠল। কিন্তু ঘোড়াটি যে জিনিষটি দেখতে পেয়ে ভয়ে কাঁপছিল, বৌদ্ধ শ্রমণ সেদিকে খুব মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন, এবং গাড়ী থেকে লাফ দিয়ে মাটিতে নেমে দেখতে পেলেন সেটি সোনার মোহর ভর্তি একটি থলি। তখন তাঁর মনের ধারণা হল, “এই থলিটি সেই ধনী শ্রেষ্ঠীর ছাড়া আর কারুরই হতে পারে না।”

(শ্রমণ) নারদ মাটি থেকে থলিটি তুলে নিয়ে দেখতে পেলেন যে তার মধ্যে অনেক স্বর্ণমুদ্রা রয়েছে। তখন তিনি সেই কৃষকটিকে

উদ্দেশ্য করে বললেন, “সেই গর্বিত ব্রাহ্মণটিকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার সুযোগ তোমার উপস্থিত হয়েছে, এবং এর দ্বারা ইহলোকেও যেমন



তেমনি পরলোকে ভাবী জন্মে তোমার কল্যাণই হবে। ঘৃণার পরিবর্তে শুভেচ্ছা প্রসূত কাজের থেকে বেশী মধুর কোন প্রতি-
হিংসাই হতে পারে না। আমি তোমার হাতে এই খলিটি দিচ্ছি।
যখন তুমি বারাণসীতে গিয়ে পৌঁছাবে, তখন আমি তোমাকে যে
সরাইখানাটি দেখিয়ে দেব, সেইখানে তুমি গাড়ীটি নিয়ে যেও।
সেখানে তুমি পাণ্ডু নামে সেই ব্রাহ্মণের খোঁজ করে তার হাতে
এই সোনার খলিটি ফিরিয়ে দিও। সে তখন নিশ্চয়ই তার রুঢ়
আচরণের জন্ত তোমার কাছে মার্জনা চাইবে। তখন তুমি তাকে
বলবে যে তুমি তাকে ক্ষমা করেছ এবং তার সকল কাজ যাতে
সফল হয় সেই কামনাই তুমি করো। কেননা, আমি তোমাকে
বলে রাখছি, তার সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে তোমারও অবস্থার উন্নতি
হবে। তোমার ভাগ্যি বহুলাংশে তার ভাগ্যের উপরই নির্ভর

করছে। যদি সেই রক্তকার শ্রেণীটি কোনও কারণ জানতে চায়, তবে তাকে আমাদের বিহারে^১ যেতে বলো। সে যদি মনে করে কোন সাহায্যের প্রয়োজন আছে ত সে দেখতে পাবে যে তাকে সৎপরামর্শ দিয়ে সাহায্য করবার জ্ঞান আমি সর্বদাই প্রস্তুত।”

বারাণসীর হাটে বেচা-কেনা

দৈনন্দিন জীবন যাত্রার জগ্গে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র অতি মুনাফার লোভে বাজার থেকে সরিয়ে ফেলার ফন্দী আধুনিক আবিষ্কার নয়। ইহুদিদের ধর্ম গ্রন্থ Old Testament-এ জোসেফ নামে একটি দরিদ্র মুদী তরুণের কাহিনী আছে। সে শেষ পর্যন্ত রাজ্যের মন্ত্রী পর্যন্ত হয়েছিল, আর তার চতুর বিবেকবর্জিত ব্যবসায়-বুদ্ধির জোরে সে বাজারে সব গম সরিয়ে ফেলেছিল, যাতে করে রাজ্যের দরিদ্র প্রজাগণ ক্ষুধার তাড়নায় কারোর কাছে তাদের বিষয় সম্পত্তি সব কিছু এমন কি প্রাণ পর্যন্ত বেচতে বাধ্য হয়। আর বুদ্ধি জাতকের গল্পেও আমরা দেখতে পাই, কাশীর (বারাণসীর প্রাচীন নাম) এক রাজার কোষাগারিক কি ভাবে জনৈক অশ্ব ব্যবসায়ী, যে পাঁচশ ঘোড়া সঙ্গে নিয়ে রাজধানীতে এসে পৌঁছেছিল—তাকে অনুবিধায় ফেলবার জগ্গে বাজার থেকে (পশু খাছু) খড়, ঘাস জাতীয় সব কিছু সরিয়ে ফেলেছিল ও এইভাবে তার জীবনের প্রথম বৈষয়িক সাফল্যের সন্ধান পেয়েছিল।

পাণ্ডু নামে সেই রত্নবণিক যখন বারাণসীতে এসে উপস্থিত হলেন, ঠিক সেই সময়েই এক বেপরোয়া ফাটকাবাজ বাজার থেকে সব চাল সরিয়ে ফেলেছিল। তার ফলে মল্লিক নামে এক ধনী মহাজন, যে ছিল ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে পাণ্ডুর বন্ধু, সে খুবই বিপদে পড়েছিল। শ্রেষ্ঠীর সঙ্গে দেখা করে সে বলল, “আমার সর্বনাশ

হয়ে গেছে। তোমার সঙ্গে একযোগে ব্যবসা চালান আমার পক্ষে আর সম্ভব হবে না, যদি না এই মুহূর্তেই আমি রাজার আহ্বারের উপযোগী এক গাড়ী উৎকৃষ্ট চাল যোগাড় করতে পারি। বারাণসীতে আমার এক প্রতিদ্বন্দ্বী মহাজন আছে। সে জানতে পেরেছে যে রাজার কোষাগারধ্যক্ষের সঙ্গে আগামী কাল সকালেই একগাড়ী চাল যোগান দেবার জন্তে আমার এক চুক্তি হয়েছে। তাই সে আমার সর্বনাশ করবার জন্তে উঠে পড়ে লেগেছে, আর সেই জন্তেই বারাণসীর বাজার থেকে সব চাল কিনে সরিয়ে ফেলেছে। কোষাধ্যক্ষ নিশ্চয়ই তার কাছ থেকে কিছু ঘুষ খেয়েছে। কেন না, সে কিছুতেই আমার সঙ্গে তার চুক্তি বাতিল করতে রাজী নয়। আর ইতিমধ্যে স্বর্গ থেকে কোন দেবদূত যদি না সাহায্য করবার জন্তে নেমে আসেন ত আগামী কাল আমি সর্বস্বান্ত হয়ে যাব।”

মল্লিক যখন তার ভাবী দারিদ্র্যের কথা চিন্তা করে, যে দারিদ্র্যের দিকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবসায়ীটি তাকে ঠেলে দিতে চলেছে,— ব্যাকুলভাবে আক্ষেপ করছিল, ঠিক সেই সময়েই পাণ্ডু তার টাকার থলিটি হারায়। সে তার গাড়ীর ভিতর চারিদিকে খুঁজতে লাগল, কিন্তু থলিটির হদিশ মিলল না। তখন সে তার ভৃত্য মহাদূতকে সন্দেহ করতে লাগল। স্থানীয় আরক্ষাপুরুষকে ডেকে সে তার সামনে মহাদূতকে চুরির অপরাধে অভিযুক্ত করল। রক্ষীরাও তার কাছ থেকে স্বীকৃতি আদায়ের জন্ত তাকে আট্টেপৃষ্ঠে বেঁধে নিষ্ঠুরভাবে তার উপর নিপীড়ন করতে লাগল।

ভৃত্যটি যন্ত্রণায় কাতর হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল, “আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ, দয়া করে আমাকে ছেড়ে দিন। আমি এ যন্ত্রণা আর সহ্য করতে পারছি না। আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধ, অন্ততঃ এই চুরির অপরাধে আমি অপরাধী নই। তবে হয়ত আমার অন্য কোনো পাপের জন্তে আমাকে এই দুঃখ ভোগ করতে

হচ্ছে। আমার প্রভুর কথায় আমি সেই নিরপরাধ চাষীটির প্রতি অকারণ অন্তায় আচরণ করেছি। হায়! যদি এই সময় তার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করতে পারতাম! আমার ধ্রুব বিশ্বাস যে, যে যন্ত্রণা আমাকে ভোগ করতে হচ্ছে, তা আমার পূর্বকৃত রুঢ়তারই শাস্তি স্বরূপ।”



রক্ষীপুরুষ যখন মহাদূতের পিঠে চাবুকের উপর চাবুক মারছিলেন, ঠিক সেই সময়েই চাষীটিও সেই সরাইখানায় এসে হাজির হল। সে যখন টাকার ধলিটি ফিরিয়ে দিল তখন উপস্থিত সকলেই অবাক হয়ে গেল। ভৃত্যটিও অযথা নিগ্রহের হাত থেকে মুক্তি পেল। কিন্তু তার মনে তার প্রভুর প্রতি আক্রোশ ও অসন্তোষ জমেছিল—তাই সে গোপনে সেখান থেকে চলে গেল। এই সময় পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরতে ঘুরতে একদল ডাকাতির সঙ্গে তার দেখা হল। তারা তখন তার দৈহিক শক্তি ও সাহসের কথা চিন্তা করে তাকে নিজেদের দলপতি করে নিল।

মল্লিক যখন জানতে পারল যে চাষীটির কাছে সবচেয়ে ভাল চাল আছে, যে চাল রাজার পাতে দেবার মত—সে তখন গাড়ী বোঝাই সব চাল তিনগুণ দাম দিয়ে কিনে নিল। চাষীটি এত দাম পাবার চিন্তাও করতে পারেনি। পাণ্ডু কিন্তু তার টাকার ধলিটি ফিরে পেয়ে মনে মনে খুব উৎফুল্ল—আর সেই সং চাষীটিকে যথোচিত পুরস্কৃত করলে। তারপর কালক্ষেপ না ক’রে বিহারের দিকে চলল—সেখানে নারদ নামে শ্রমণের কাছ থেকে আরও জ্ঞাতব্য সংবাদ জানবার জন্যে ঔৎসুক্য যেন আর ধরে রাখতে পারছিল না।

নারদ বললেন : আমি সব কিছু ঘটনার ব্যাখ্যা তোমার কাছে খুলে বলতে পারি বটে কিন্তু কোন উন্নত আধ্যাত্মিক তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করবার মত ক্ষমতা তোমার নেই। তাই মৌন অবলম্বন করাই সমীচীন মনে করি। তবে তোমাকে আমি কিছু উপদেশ দিতে চাই—যে কোনো লোকের সঙ্গে তোমার দেখা হোক না কেন, তাকেই তুমি নিজের মত ব্যবহার করো। তোমার প্রতি অণু যে রকম ব্যবহার করুক বলে তুমি প্রত্যাশা কর, তার প্রতিও ঠিক সেই রকম ব্যবহার করবার কথা চিন্তা করো। কেন না, আমাদের কর্মের গতি অবিরাম অমোঘ। এর গতি হয়ত খুব মন্থর, আর পথও প্রায়ই দীর্ঘ। কিন্তু ভালই হোক আর মন্দই হোক, শেষ পর্যন্ত কর্ম আমাদের খুঁজে বার করবেই! সেই জন্তই বলা হয়ে থাকে—

“ধীর মন্থর পদে অমোঘ গতিতে কর্ম এগিয়ে চলে কর্তার দিকে। তাই করুণার বীজ বপন করো, যাতে পরিণামে তার থেকে পরম শান্তিরূপ শস্য আহরণ করতে পার।”

শ্রেষ্টী তা’ শুনে বলে ওঠে, “হে ভদ্র শ্রমণ! ঘটনার কারণগুলি আমার নিকট ব্যাখ্যা করে বলুন। তা’ হলে হয়ত’ আপনার উপদেশ মেনে চলা আমার পক্ষে সহজ হবে।”

শ্রমণ বললেন : “তবে শোনো। আমি তোমাকে রহস্যের চাবিকাঠিটি দিচ্ছি। যদি তুমি বুঝতে না পার, তবে আমার কথায় আস্থা রেখো। আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করা এক প্রকার ভ্রম। যার চিন্তা আত্মার অন্বেষণে ব্যস্ত, সে শুধু এক আলেয়ার অনুসরণ করে চলেছে যা তাকে শেষ পর্যন্ত পাপের পক্ষে নিমজ্জিত করবেই। আত্মার বিষয়ে এই বিভ্রম সূক্ষ্ম ধূলিকণার মত দৃষ্টি-শক্তিকে অন্ধ করে দেয়, যার ফলে তোমার সঙ্গে তোমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় পরিজনবর্গের নিবিড় সম্বন্ধ অনুধাবন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সঙ্গে যত না অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ তার থেকেও ঢের বেশী অন্তরঙ্গ সম্পর্ক তোমার সঙ্গে তোমার পার্শ্ববর্তী আত্মীয় স্বজন ও পরিজনবর্গের। অপরের আত্মার সঙ্গে তোমার আত্মার অভেদ উপলব্ধি করবার জন্তে তোমাকে চেষ্টা করতে হবে। অজ্ঞানই সকল পাপের মূল। অতি অল্প সংখ্যক লোকই সত্যের যথার্থ স্বরূপ জানেন। এই উপদেশটিই তোমার রক্ষাকবচ হোক—

‘যে অপরকে আঘাত করে সে কেবল নিজেকেই ক্ষত বিক্ষত করে মাত্র। যে অপরকে সাহায্য করে সে নিজেকেই বেশী করে সাহায্য করে। তোমার মন থেকে আত্মা সম্বন্ধে ভ্রম দূর হোক। এবং তুমি নিশ্চয়ই যথার্থ পথ খুঁজে পাবে। সে পথ তোমার কাছে ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠবে।’

‘যার দৃষ্টি ব্যবহারিক জগতের অজ্ঞানের ধূলিতে আচ্ছন্ন, আধ্যাত্মিক জগৎ তার দৃষ্টিতে অসংখ্য খণ্ডিত আত্মায় আকীর্ণ বলে প্রতিভাত হয়ে থাকে। ফলে পুনর্জন্ম সম্বন্ধে নানা সংশয়ে সে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। এবং সর্বজীবব্যাপী মৈত্রী ও করুণার প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করার মত ক্ষমতা সে হারিয়ে ফেলে।’

শ্রেষ্টী তখন উত্তর দেন, “হে ভদ্র শ্রমণ, আপনার কথাগুলি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। আমি সব সময় সেগুলি মনে রাখব। বারাণসী

অভিमुखে আসবার সময় পথিমধ্যে আমি এক দরিদ্র শ্রমণের প্রতি যৎসামান্য দয়া দেখিয়েছিলুম—তার জন্তে আমাকে কিছু ব্যয় করতে হয় নি। কিন্তু কি আশ্চর্য! তার ফল কতই না শুভ! আমি আপনার কাছে গভীর ভাবে ঋণী। কেন না আপনার সাহায্য ছাড়া আমি যে শুধু টাকার ধলিটিই হারাতাম তাই না, আমার পক্ষে বারাগসীতে ব্যবসা করাও অসম্ভব হয়ে পড়ত, যা আমার সমস্ত সম্পদের মূলে। আর এই ব্যবসা যদি বন্ধ হয়ে যেত, তাহলে আমাকে ঘোরতর দারিদ্র্যের মধ্যে পড়তে হত। তাছাড়া আপনার বিবেচনা শক্তি এবং চাষীটির চাল বোঝাই গাড়ীটির হঠাৎ আবির্ভাবের ফলে আমার বন্ধু শ্রেষ্ঠী মল্লিকের ঐশ্বর্য অক্ষুণ্ণ থাকতে পেরেছে। যদি সব লোকই আপনার উপদেশের মর্ম উপলব্ধি করতে পারত, তাহলে আমাদের এই সংসার আরও কত সুন্দরই না হত! অশুভের হ্রাস হত, এবং জনসাধারণের কল্যাণও অনেক বৃদ্ধি পেত।”

শ্রমণ উত্তর দিলেন, “জগতে যত ধর্ম আছে, বুদ্ধের প্রচারিত ধর্মের মত কোনটিই নয়। এ ধর্মের আদিতে মহান্ (glorious), মধ্যে মহান্, পরিণামেও মহান্। শুধু আক্ষরিক ভাবেই এ ধর্ম মহিমান্বিত নয়, এর আধ্যাত্মিক তাৎপর্যও সমান মহিমান্বিত। এ ধর্ম মৈত্রী ও করুণার ধর্ম যা মানুষকে সর্ববিধ অহংভাব (egotism) থেকে মুক্ত করে ও তাকে ক্ষুদ্র স্বার্থের গণ্ডী থেকে উদ্ধে উন্নীত করে, অপার শাস্তি লাভে সাহায্য করে, যার মূলে আছে সম্যক্ জ্ঞান। আর সংকর্মের মধ্য দিয়েই সেই সম্যক্ জ্ঞানের প্রকাশ ঘটে থাকে।”

পাণ্ডু নিঃশব্দে মাথা নেড়ে শ্রমণের কথায় সায় দিয়ে বললেন : “বুদ্ধদেবের প্রচারিত সদ্ধর্মের মর্ম যাতে জনসাধারণ উপলব্ধি করতে পারে, তার জন্তে আমার আগ্রহের সীমা নেই। তাই মনে করেছি, আমার জন্মভূমি কৌশাহীতে আমি একটি বিহার প্রতিষ্ঠা করব, যাতে করে ভগবান্ বুদ্ধের শিষ্যসংঘের উদ্দেশ্যে তা উৎসর্গ করতে পারা যায়।”

দস্যুমধ্যে

তারপর অনেক বৎসর অতীত হয়ে গেছে। কৌশান্মীতে পাণ্ডুর প্রতিষ্ঠিত বিহার জ্ঞানবৃদ্ধ শ্রমণমণ্ডলীর মিলনকেন্দ্র হয়ে উঠেছে। পুরবাসীদের কাছে বিহারটি একটি প্রসিদ্ধ সাধনকেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল।

সেই সময়ে প্রতিবেশী একটি রাজ্যের রাজার কাণে পাণ্ডুর তৈরী রত্নালঙ্কারের খ্যাতি ও সৌন্দর্যের কথা গিয়ে পৌঁছল। তিনি তাঁর কোষাগারিককে পাণ্ডুর কাছে পাঠালেন, তাঁর জন্মে খাঁটি সোনার একটি রাজমুকুট তৈরী করে দেবার জন্মে, তাতে বসান থাকবে ভারতবর্ষের সবচেয়ে মূল্যবান রত্নরাজি। পাণ্ডুও সানন্দে তাঁর নির্দেশ মত এক অপূর্ব কারুকার্য খচিত রাজ-কিরীট তৈরী করলেন। যখন সেটি তৈরীর কাজ শেষ হল, তখন তিনি সেটি নিয়ে রাজার প্রাসাদের অভিমুখে যাত্রা করলেন। এই সুযোগে শ্রেষ্ঠীর মনে আরও কিছু বেচাকেনা করে লাভ করার ইচ্ছেও ছিল। তাই তিনি যাত্রার সময় বহু মূল্যবান স্বর্ণালঙ্কার সঙ্গে নিয়ে চললেন।

যে শকটে করে পাণ্ডু তাঁর জিনিষপত্র নিয়ে যাচ্ছিলেন, তার চার পাশে রক্ষক হিসেবে বেশ কয়েকজন সশস্ত্র শক্তিশালী পুরুষও ছিল। যেতে যেতে যখন তারা এক পাহাড়ের কাছে হাজির হল হঠাৎ কোথা থেকে একদল ডাকাত তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সেই ডাকাতদলের সর্দার ছিল সেই মহাদূত। সে তাদের সকলকে মারধোর করে তাড়িয়ে দিয়ে, যা কিছু রত্ন ও স্বর্ণালঙ্কার তাদের সঙ্গে

ছিল সব কেড়ে নিল। পাণ্ডু অনেক কষ্টে কোনও প্রকারে প্রাণ নিয়ে পালাতে পারল। আকস্মিক এই বিপত্তি পাণ্ডুর জমজমাট অবস্থার ওপর প্রচণ্ড আঘাত হানল। ইতিপূর্বে পাণ্ডুর ব্যবসায়ে আরও কিছু বড় রকমের লোকসান হয়েছিল, ফলে তাঁর ধন দৌলতের পরিমাণ বেশ হ্রাস পেল।



পাণ্ডুর অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে পড়ল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর এই দুর্ভাগ্য তিনি নীরবে সহ্য করলেন। মনে মনে ভাবতে লাগলেন : “নিশ্চয়ই পূর্বজন্মে আমি এমন কিছু পাপ করেছি, যার ফলস্বরূপ আমাকে এই সব ক্ষতি সহ্য করতে হচ্ছে। আমার বয়স যখন কম ছিল আমি অশ্বের উপর অনেক রুঢ় আচরণ করেছি। এখন যখন আমি আমার পূর্বকৃত কর্মের ফল ভোগ করছি, তখন তার জন্তে কারুর বিরুদ্ধে ক্ষোভের কোনও কারণই থাকতে পারে না।”

অন্তের প্রতি করুণার ভাব পাণ্ডুর মনে ক্রমশঃ বাড়িতে লাগল ; ফলে তিনি যতই দুঃখ ভোগ করুন না কেন, তার দ্বারা ক্রমশই তাঁর চিত্তশুদ্ধি ঘটতে লাগল। আর তিনি যখন তাঁর বর্তমান দীন অবস্থার কথা চিন্তা করতেন, কেবলই তাঁর মন দুঃখ ভারাক্রান্ত হ'ত এই ভেবে যে তিনি তাঁর বিহারের বন্ধুদের কোন উপকার বা সাহায্যই করতে পারছেন না—যাতে করে ভগবান তথাগত প্রবর্তিত সদ্ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব চারিদিকে প্রচার হতে পারে।

এই ভাবে আরও কিছুকাল অতিবাহিত হল। একদিন ঘটনা-চক্রে নারদের শিষ্য পন্থক নামে এক তরুণ শ্রমণ যখন কৌশাঘীর পর্বতশ্রেণীর ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ একদল দস্যুর হাতে তিনি পড়লেন। তাঁর কাছে টাকাকড়ি কিছুই ছিল না। তাই দস্যুদলপতি তাঁকে নিষ্ঠুর ভাবে প্রহার করে ছেড়ে দিল।



পরদিন প্রভাতে পন্থক যখন বনের মধ্য দিয়ে তাঁর পথ ধরে যাচ্ছিলেন, তিনি শুনতে পেলেন একদল লোক মিলে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া মারামারি করছে। শব্দ অনুসরণ করে জায়গাটির দিকে এগিয়ে গিয়ে তিনি কয়েকজন দস্যুকে দেখতে পেলেন। আর

তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে দলপতি মহাদূত। মহাদূত প্রাণপণে তাদের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করছিল। শিকারী কুকুরের দল সিংহকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেললে যেমন হয়, ঠিক তেমনি ভাবে। তার বলিষ্ঠ মুষ্টির আঘাতে কয়েকজন দস্যু নিহত হল বটে কিন্তু তখনও বেশ কয়েকজন বাকী রয়ে গেল— তাদের সঙ্গে লড়াই করা একা মহাদূতের পক্ষে বেশ কঠিন হয়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত তার শক্তি নিঃশেষিত হল। ক্ষত বিক্ষত দেহে আঘাতে জর্জরিত হয়ে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

দস্যুরা যেমনি সেখান থেকে পালাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গেই সেই ওরুণ শ্রমণ পন্থক সেদিকে এগিয়ে গেলেন যদি তার দ্বারা আহতদের কিছু সাহায্য করা সম্ভব হয়। তিনি দেখলেন, সব ডাকাতই মরে গেছে, শুধু দলপতির অসার দেহে কিছু প্রাণের স্পন্দন থাকলেও থাকতে পারে।

কাল বিলম্ব না করে পন্থক পাহাড়ের নিচে কুলু কুলু শব্দে প্রবাহিত শীর্ণ তটিনীর দিকে নেমে গেলেন। তাঁর ভিক্ষাপাত্র করে স্নিগ্ধ জল ভরে নিয়ে মৃত্যুপথ যাত্রী সেই লোকটির কাছে ফিরে এলেন। মহাদূত চোখ মেলে চেয়ে রাগে দাঁতে দাঁত ঘষে বলে উঠল—“সেই অকৃতজ্ঞ কুকুরের দল সব কোথায়? তাদেরই না আমি বিজয় ও সাফল্যের আশ্বাদ পাইয়ে দিয়েছি? আমাকে দলপতি হিসেবে না পেয়ে সুচতুর ব্যাধকর্তৃক বিভাড়িত ফেরুপালের মত তাদের শীর্গগিরই মরতে হবে।”

তার এই কথা শুনে পন্থক বললেন—“তুমি তোমার পাপজীবনের সঙ্গীদের কথা চিন্তা করছ কেন? বরং তুমি এখন তোমার নিজের অদৃষ্টের কথাই চিন্তা কর। শেষ মুহূর্তে মুক্তির যে সুযোগ তোমার সামনে উপস্থিত, তার সদ্ব্যবহার করার চেষ্টা কর। এই নাও পানীয় জল। আমাকে তোমার ক্ষতস্থান পরিচর্চা করতে দাও হয়ত শেষ পর্যন্ত আমি তোমার জীবন রক্ষা করতে পারি।”

মহাদূত সবিস্ময়ে বলে উঠল—“হায় হায়! তুমিই না সে লোক যাকে গতকাল আমি মারধোর করেছিলাম? সেই তুমি কিনা আমাকে সাহায্য করবার জন্যে নির্মল পানীয় এনেছ! আমার জীবন রক্ষার জন্যে তুমি চেষ্টা করছ! কিন্তু হে ভদ্র শ্রমণ! এ সবই নিষ্ফল, আমার নিয়তির বিধান অপরিবর্তনীয়। দুঃস্বাদ আমাকে মেরে মৃতপ্রায় করে ফেলেছে—অকৃতজ্ঞ ভীকুদল! আমিই তাদের আঘাত করতে শিখিয়েছিলাম। এখন তারাই আমাকে আঘাত করে তার সমুচিত প্রতিদান দিয়ে গেল।”

শ্রমণ বলতে লাগলেন : “তুমি তোমার কৃতকর্মেরই ফলভোগ করছ। যদি তুমি তোমার সঙ্গীদের দয়া করতে শিক্ষা দিতে, তবে তুমিও তাদের কাছ থেকে দয়া পেতে। কিন্তু তুমি তাদের প্রাণনাশ করতে শিক্ষা দিয়েছিলে—তাই তুমি যে তাদের হাতে নিহত হতে চলেছ, এ তোমারই কৃতকর্মের পরিণাম ছাড়া কিছু নয়।”

তখন দস্যুদলপতি উত্তর দিল—“আপনি যথার্থ কথাই বলেছেন। আমার অদৃষ্টের জন্য আমি নিজেই দায়ী। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য কি ভয়ানক! ভবিষ্যতে জন্ম জন্ম ধরে আমার যাবতীয় দুঃকর্মের ফল নিঃশেষে ভোগ করতে হবে। হে ধার্মিক শ্রমণ! আমাকে উপদেশ দিন কিভাবে আমি আমার জীবনভর অল্পশ্রুতি পাপের দুর্বহ ভার হালকা করে ফেলতে পারি—যে ভার আমার বুকের ওপর পাথরের মত চেপে রয়েছে। আমার শ্বাস রুদ্ধ করে ফেলবার উপক্রম করছে।”

পন্থক বললেন—“তোমার যত কিছু পাপ চিন্তা সব হৃদয় থেকে উন্মূলিত করে ফেল। যত কিছু ছরভিসন্ধি সব দূর কর। সকলের প্রতি সমান মৈত্রী ও করুণায় তোমার হৃদয় পূর্ণ করে তোল।”

লুতা-তন্ত

সেই সেবাপরায়ণ শ্রমণটি যখন মহাদূতের ক্ষতস্থান ধুয়ে দিচ্ছিলেন, তখন দস্যুদলপতি তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলল—“আমি বহু পাপ কাজ করেছি, সংকর্ম কিছুই করিনি। আমি কি করে আমার নিজের হৃদয়ের দুঃখজ্বাল, যা আমি আমার কলুষ বাসনা দিয়ে নিজেই বয়ন করেছি, তার থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারব? আমার কর্ম নিশ্চিত আমাকে নরকের দিকে নিয়ে যাবে; আমার পক্ষে বোধ হয় কখনো ফিরে মুক্তির পথে চলা সম্ভব হবে না।”

শ্রমণ বললেন—“সত্যি বটে। তোমার কর্ম ভাবী জন্মেও সহস্র রোপিত অশুভ বীজের ফল ভোগ করেই চলবে। তোমার কর্মের (অবশ্যভাবী) ফলের হাত থেকে কিছুতেই বেহাই নেই। কিন্তু তাই বলে একেবারে নিরাশ হবার কোন হেতু নেই। যে লোক (তথাগতের ধর্মে দীক্ষিত হয়ে) সংপথে প্রবৃত্ত হয়েছে এবং আত্মা সম্বন্ধে ভ্রান্ত দৃষ্টি বর্জন করে সকল বাসনা ও পাপ চিন্তা দূর করতে পেরেছে, সে যেমন নিজের কল্যাণ সাধন করতে পারবে, তেমনি অপরের কল্যাণেরও কারণ হবে।

“এই প্রসঙ্গে তোমাকে একটা গল্প বলি শোন। এক সময়ে কন্দত নামে এক দুর্বৃত্ত দস্যু ছিল। মৃত্যুর পূর্বে তার নিজের আচরণ সম্পর্কে তার কোন অনুশোচনাই হয়নি। তাই তাকে জন্মগ্রহণ করতে হয় নরকে দৈত্যরূপে। সেখানে তার দুষ্কৃতির জন্তে

অসহ্য যন্ত্রণা ও ক্লেশ সহ্য করতে হল। এই ভাবে কয়েক কল ধরে তাকে নরকে বাস করতে হল—সে কিছুতেই তার সেই দুর্দশা থেকে



মুক্তি পেল না। ইতিমধ্যে ভগবান বুদ্ধ মর্ত্যে অবতীর্ণ হয়ে বোধি লাভ করেছেন। ঠিক সেই শুভ স্মরণীয় মুহূর্তটতে নরকের অন্ধকার ভেদ করে একটি উজ্জ্বল আলোকরশ্মি প্রবেশ করল—তার ফলে নরকের অধিবাসী সব দৈত্যদের মধ্যেই যেন নতুন প্রাণ ও আশার সঞ্চার হল। সেই দস্যু কন্দত বলে উঠল : ‘হে ভগবান বুদ্ধ ! আমার ওপর কৃপা কর। আমি অকথ্য যাতনা ভোগ করছি। আমি অনেক দুষ্কর্ম করেছি বটে, কিন্তু এখন আমি চাই সংপথে

ফিরে যেতে। কিন্তু এই দুঃখজাল থেকে নিষ্কৃতি পাবার শক্তি আমার নেই। হে ভগবান! আমাকে সাহায্য কর। আমি যেন তোমার করুণা থেকে বঞ্চিত না হই।’

“কর্মের নিয়মই এই যে অশুভ কর্ম বিনাশের পথে নিয়ে যায়। কেননা অবিমিশ্র অশুভ কখনও নিজেকে টিংকিয়ে রাখতে পারে না। অবিমিশ্র অশুভ অস্তিত্বের বিরোধী। অপর পক্ষে সংকর্মের গতি জীবনের দিকে। এই ভাবে কর্মমাত্রেরই অন্ত আছে। কিন্তু সংকর্মের বিকাশের পথ অনন্ত প্রসারিত। অতি সামান্যতম শুভ কর্মও যে ফল প্রসব করে তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে ভাবী সংকর্মের সুপ্ত বীজ, এবং সেগুলি ক্রমশই বৃদ্ধি পেতে থাকে। সংসারের সেই অন্তহীন পরিক্রমায় ক্লান্ত, দুঃখতপ্ত জীবকুল তার থেকে পরিতুষ্টি লাভ করে ধন্য হয় এবং শেষ পর্যন্ত নির্বাণলাভ করে সর্ববিধ অকল্যাণ থেকে চিরতরে মুক্তি লাভ করতে সমর্থ হয়।

“ভগবান বুদ্ধ যখন নরকবাসী দুঃখতপ্ত সেই দৈত্যটির কাতর প্রার্থনা শুনতে পেলেন তখন তিনি বললেন : ‘কন্দত, তুমি কি কখনও কোনও দয়ার কাজ করেছ? তা হলে এই মুহূর্তে তা তোমার কাছে ফিরে আসবে এবং তোমার উদ্ধারে সাহায্য করবে। কিন্তু যে সব তীব্র যন্ত্রণা ও দুঃখ তোমার অশুভ কর্মের ফল স্বরূপ তোমাকে ভোগ করতে হচ্ছে, তা যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার হৃদয়ের মিথ্যা অহংবোধ সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত না করছে এবং আত্মাভিমান, কামনা, ঈর্ষ্যা ও দ্বেষ উন্মূলিত করে তোমার চিত্তকে নির্মল করে তুলছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার মুক্তির কোন সম্ভাবনাই নাই।’

“কন্দত নীরব হ’য়ে রইল—কেন না সে ছিল নির্দয়। কিন্তু ভগবান তথাগত ছিলেন সর্বজ্ঞ—তিনি তাঁর অলৌকিক শক্তির সাহায্যে সেই হতভাগ্য জীবের প্রাক্তন যাবতীয় কর্ম প্রত্যক্ষ দেখতে পেলেন। তিনি জানতে পারলেন—অতীতে কোন এক সময় বনে ঘুরতে ঘুরতে কন্দত একটি মাকড়সাকে মাটির ওপর দিয়ে এগিয়ে

যেতে দেখে ভেবেছিল—আমি এই মাকড়সাটিকে মাড়াব না। কেন না সে কোনও অনিষ্ট করেনি এবং কারুকেই সে আঘাত করে না।

“বুদ্ধ করুণাসহকারে কন্দতের অসহ্য যন্ত্রণার দিকে তাকালেন, আর তাকে সাহায্যের জন্য মাকড়সার জালের মধ্যে একটি



মাকড়সাকে পাঠিয়ে দিলেন। তখন সেই মাকড়সাটি কন্দতকে বলল—এই সূতাটি ধরে উঠে এস।

“মাকড়সার জালটিকে সেই নরকের গভীর তলদেশে লাগিয়ে

রেখে এসে মাকড়সাটি সরে পড়ল। কন্দত আগ্রহভরে সেই সূক্ষ্ম বস্তুটি আঁকড়ে ধরে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল উঠে আসার জন্য। এবং শেষ পর্যন্ত তার চেষ্টা সফলও হল। তন্তুটি এত মজবুত ছিল যে এটি ছিঁড়ে পড়ে নি। কন্দতও ক্রমশঃ তাই ধরে উঁচুতে উঠতে লাগল।

“হঠাৎ তার যেন মনে হল সূতাটি কাঁপছে—সে পেছন দিকে চোখ ফিরিয়ে দেখতে পেল যে আরও কয়েকজন লোক, যারা তার সঙ্গে নরক যন্ত্রণা ভোগ করছিল, তারাও সেই সূতা ধরে উঠতে আরম্ভ করেছে। তা দেখে কন্দতের মনে ভয় হল। সে দেখতে পেল সূতোটি ভীষণ সরু। আর ক্রমশই তার যত বাড়ছে সূতোটিও ততই বেড়ে লম্বা হয়ে চলেছে। কিন্তু তৎসঙ্গেও তার ভার বইবার মত জোর তাতে ছিল। এতক্ষণ পর্যন্ত কন্দত কেবল উপরের দিকেই তাকিয়ে ছিল। কিন্তু এখন সে নীচের দিকে তাকাতে লাগল, আর তার নজরে পড়ল তার পিছু পিছু সেই মাকড়সার সূতোটি ধরে অসংখ্য নরকবাসী ওপরের দিকে উঠে আসছে। সে মনে মনে ভাবতে লাগল—এই সরু সূতোটি এত লোকের ভার কি করে বহন করতে পারবে? ভয়ে সে চোঁচিয়ে উঠল—তোমরা সব সূতো ছেড়ে দাও। এ সূতোটি আমার।

“সঙ্গে সঙ্গে সেই মাকড়সার জালটি খসে পড়ল। আর কন্দতও আবার নরকের গর্ভে পড়ে গেল।

“কন্দতের চিন্ত থেকে তখনও ভ্রান্ত অহংবোধ দূর হয় নি। উর্ধ্ব উন্নীত হবার এবং ধর্মাচরণের আর্থ (noble) মার্গে প্রবেশ করবার ঐকান্তিক আগ্রহের যে কি অতিপ্রাকৃত শক্তি থাকতে পারে, সে কখনও তা উপলব্ধি করতে পারে নি। লুতাতন্তুর মতই তা সূক্ষ্ম; কিন্তু লক্ষ লক্ষ জীবের ভার বহন করবার ক্ষমতা তার আছে, এবং যত বেশী জীবই তাকে আশ্রয় করে উঠতে এগিয়ে আসবে, প্রত্যেক ক্রেশও তদনুপাতে অল্প হবে। কিন্তু যে মুহূর্তে কোন

জীবের মনে এরূপ ধারণা জন্মাবে—‘এটি কেবল আমারই ; ধর্মপথ আশ্রয় করার যে অপার শাস্তি আমারই কেবল তাতে অধিকার, আর কেউই যেন তার অংশীদার না হতে পারে’ সেই মুহূর্তেই সেই তন্ত যায় বিচ্ছিন্ন হয়ে, আর সেই হতভাগ্য জীবও আবার তার ক্ষুদ্র অহংবোধের পরিধির মধ্যে ফিরে আসে। অহংবোধই যথার্থ শাস্তি, আর তত্ত্বজ্ঞানই পরম সুখ। নরক কাকে বলে? সংকীর্ণ অহংবোধ ছাড়া নরক বলে আর কিছুই নেই। আর ধর্মজীবনই যথার্থ নির্বাণ।”

শ্রমণ যখন তাঁর কাহিনী শেষ করলেন, তখন দম্যদলপতি বলে উঠল—“আমি ঐ মাকড়সার সূতোকেই আশ্রয় করতে চাই, যাতে করে নরকের এই অতল গহ্বর থেকে আমি নিজেকে ওপরের দিকে টেনে তুলতে পারি।”

দস্যুদলপতির দীক্ষা

মহাদূত কিছুক্ষণের জন্ত শান্তভাবে পড়ে রইল— সে তার নিজের বিক্ষিপ্ত চিন্তাগুলোকে যেন সাজাবার চেষ্টা করতে লাগল। তারপর সে অতি কষ্টে শ্রমণকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগল—

“হে মহাভাগ, শুনুন। আমি আপনার কাছে একটা স্বীকারোক্তি করতে চাই। আমি ছিলাম কৌশাস্থীর এক রত্নব্যবসায়ীর ভৃত্য। তার নাম ছিল পাণ্ডু। কিন্তু সে যখন অশ্রায় ভাবে আমার ওপর নিপীড়ন করল, তখন আমি পালিয়ে গেলাম—শেষ পর্বত এক দস্যুদলের প্রধান হলাম। কিছুকাল আগে আমি যখন আবার চরদের মুখে জানতে পারলাম যে পাণ্ডু সেই পাহাড়ী পথ দিয়ে যাচ্ছে, তখন আমি তার ধনসম্পদের একটা বড় অংশ লুট করে নিতে পারলাম। এখন কি আপনি তার কাছে গিয়ে বলবেন যে সে আমার প্রতি অশ্রায়ভাবে যে অত্যাচার করেছে আমি হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে তা ক্ষমা করেছি? সেও যেন তার টাকা কড়ি লুট করে আমি যে অপরাধ করেছি তা ক্ষমা করে। আমি যতদিন তার সঙ্গে ছিলাম, তার হৃদয় ছিল পাথরের মত কঠিন। আমিও তার চরিত্রের স্বার্থপরতা অনুসরণ করতে শিখেছিলাম। আমি শুনতে পেয়েছি যে, সে এখন উদার হয়েছে। এবং লোকে তাকে সততা ও গ্যায়ের আদর্শ বলে উল্লেখ করে থাকে। সে এখন যে বিত্ত সঞ্চয় করেছে, কোন দস্যুই তা হরণ করতে পারে না, কিন্তু

আমার ভয় হয়, আমার কর্ম অশুভ কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে দীর্ঘকাল অবিচ্ছিন্ন ধারায় বইতে থাকবে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত যতক্ষণ আমার শক্তি আছে আমি তার ঋণ শোধ করতে চাই। আমি আর তার কাছে ঋণী থাকতে চাই না। আমার হৃদয়ের সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে গেছে। আমার যা কিছু ছুঁষ্ট বাসনা সবই অন্তহিত হয়েছে। আমার জীবনের যে কয় মুহূর্ত অবশিষ্ট আছে তা আমি ব্যয় করতে চাই এমন প্রচেষ্টায় যার দ্বারা পরবর্তী জন্মে মৃত্যুর পরে আমি যেন সং চিন্তা ও সং কর্ম আশ্রয় করতে পারি। অতএব আপনি দয়া করে পাণ্ডুকে যদি জানিয়ে দিতে পারেন যে রাজার জন্মে যে স্বর্ণ মুকুট সে তৈরী করেছিল, এবং আরও যে সব ধন দৌলত তার সঙ্গে ছিল—সে সবই নিকটবর্তী একটি পাহাড়ের গুহার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছি। আমার অধীন দস্যুদলের মধ্যে মাত্র ছ'টি লোক এ খবর জানত—কিন্তু আজ তাদের দুজনের কেউই বেঁচে নেই। সুতরাং পাণ্ডু কিছু সশস্ত্র লোকজন নিয়ে সেই জায়গাটিতে গিয়ে তার অপহৃত ধন সম্পদ, যা আমি তাকে বঞ্চনা করে কেড়ে নিয়েছিলুম, সবই ফিরে পেতে পারে। এই একটি মাত্র সংকাজের দ্বারা আমার অনেক পাপ কাজ ধুয়ে যাবে। এর ফলে আমার চিন্তা থেকে এর গ্রানি বিধৌত হয়ে যাবে। আর আমি মুক্তির অন্বেষণে নির্ভুল দিক লক্ষ্য করে যাত্রা করবার প্রেরণা পাব।”

তখন মহাদূত সেই পার্বত্যগুহাটির অবস্থান বর্ণনা করল এবং তার পরই শ্রান্ত হয়ে শুয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণের জন্ত সে চোখ বুজে পড়ে রইল—যেন নিদ্রিত। তার ক্ষতস্থানের যত্নগা আর ছিল না। সে শান্তভাবে শ্বাস গ্রহণ করতে লাগল। কিন্তু তার জীবন আস্তে আস্তে শুষ্ক হয়ে আসছিল। সে যেন কোন সুখশ্রুতি থেকে জেগে উঠেছে বলে মনে হল। সেই অবস্থায় মহাদূত শ্রমণকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল—

“আর্থ! আমার পক্ষে এটা কত আশীর্বাদ যে ভগবান বুদ্ধ এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং আপনাদের উপদেশ দিয়েছিলেন—যার ফলে আপনার পথের সঙ্গে আমার পথ আজ মিলতে পারল এবং আমি আপনার সান্নিধ্য লাভ করে ধন্য হলাম। আমি যখন তল্লাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম তখন যেন আমার মনশ্চক্ষের মাধ্যমে তথাগতের নির্বাণলাভের দৃশ্যটি ভেসে উঠল। আমার পূর্বজীবনে একবার সেই দৃশ্যটি চিত্রিত দেখেছিলুম—যা আমার মনে গভীর দাগ কেটেছিল। আজ আমার মরণের মুহূর্তে সেই স্মৃতি আমার সান্নিধ্য বহন করে এনেছে।”

শ্রমণ বললেন—“সত্যিই ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাব একটা আশীর্বাদই বটে। তিনি অশুভ চিন্তা ও ভ্রান্তির অন্ধকার দূর করে পরম উপলব্ধি লাভ করেছিলেন। তিনি আমাদের মধ্যে আমাদেরই একজন হয়ে জীবন ধারণ করেছিলেন, তাঁর সঙ্গে অশ্রু মর্ত্য জীবের যেন কোনও প্রভেদই ছিল না। তবুও তিনি নিজের মধ্যে যাবতীয় স্বার্থপরতার বীজ নির্মূল করতে পেরেছিলেন—সব লালসা, ধন-লোভ, সুখের প্রতি আসক্তি, ক্ষমতা ও যশের জঘন্য উদগ্র লিপ্সা, বৈষয়িক যাবতীয় পদার্থের প্রতি আকর্ষণ এবং ক্ষণস্থায়ী বিভ্রান্তি-জনক বিষয়কে আঁকড়ে থাকার আগ্রহ—সব কিছুই তিনি দমন করতে পেরেছিলেন। একটিমাত্র লক্ষ্যের দিকেই তাঁর দৃষ্টি ছিল নিবদ্ধ—কি করে অমৃতত্ব লাভ করতে পারা যায়, এবং নিজের মধ্যে সেই মৃত্যুহীন সত্তাকে বাস্তব করে তুলতে পারা যায়। অবশেষে পূর্ব জন্মের কুশল কর্ম এবং তার নিজের জীবন দিয়ে তিনি পরম কল্যাণের আকর স্বরূপ নির্বাণ অবস্থা লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এবং যখন জীবনের সেই অন্তিম মুহূর্তটি উপস্থিত হল তিনি নিঃশব্দে সেই মহাপ্রয়াণের দ্বার অতিক্রম করে চলে গেলেন—সে অবস্থার পশ্চাতে আর কিছুই পড়ে থাকে না। যা কিছু ক্ষণিক ও নশ্বর সবই নিঃশেষে ভস্ম হয়ে যায়। হায়! যদি সকল

মানুষই আসক্তি বিসর্জন দিয়ে বাসনা, ঈর্ষ্যা ও ঘৃণা হতে নিজেদের মুক্ত করতে পারত।”

তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি যেমন নির্মল শীতল মধুর পানীয় পান করে পরিতৃপ্তি লাভ করে মহাদূতও ঠিক তেমনি আগ্রহভরে শ্রমণের সেই কথাগুলি হৃদয়ে ধারণ করল। সে একবার কিছু বলবার জন্মে চেষ্টা করল কিন্তু তার মুখ বা ওষ্ঠদ্বয় খোলবার মত শক্তি সে সঞ্চয় করতে পারল না। সে ইঙ্গিতে তার সম্মতি জানাল এবং ভগবান তথাগতের ধর্ম আশ্রয় করবার জন্মে তার উৎকণ্ঠা প্রকাশ করল।



পন্থক ব্রহ্মপথ যাত্রী মহাদূতের ওষ্ঠদ্বয় সিক্ত করে দিলেন ও তার বহুধা দূর করবার জন্মে চেষ্টা করতে লাগলেন। যখন

সেই দস্যুদলপতি কিছু বলতে না পেয়ে নিঃশব্দে তার ছ'হাত জোড় করল, পন্থক তখন তার হয়ে তার মনের যে সব সঙ্কল্প প্রকাশ করবার জন্তে ব্যাকুল হ'য়েছিল কিন্তু নিজের অক্ষমতাবশতঃ পেয়ে উঠছিল না, সেগুলি নিজে স্বকণ্ঠে উচ্চারণ করতে লাগলেন। মহাদূতের কাণে শ্রমণের সেই কথাগুলি যেন সঙ্গীতের মত মনে হতে লাগল। তার চিত্ত আনন্দে ভরে উঠল, যে আনন্দের উৎস সাধু সঙ্কল্প। আসন্ন পরিপূর্ণ ও উন্নততর জীবনের সম্ভাবনায় তার চিত্ত সম্মোহিত হয়ে উঠল, সে মুগ্ধ দৃষ্টিতে সামনের দিকে চেয়ে রইল, তার সকল যত্নগার উপশম হল।

এইভাবে সেই দস্যুদলপতি তথাগতের ধর্মে দীক্ষিত হয়ে শ্রমণের ক্রোড়ে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে দেহত্যাগ করল।

মহাদূতের সমাধিসন্দির

তরুণ শ্রমণ পশ্চক কৌশান্মীতে পৌঁছে সেখানকার স্থানীয় বিহারে পাণ্ডু নামে সেই রত্নব্যবসায়ীর খোঁজ নিলেন। সেখান থেকে তার গৃহে উপস্থিত হয়ে সম্প্রতি বনের মধ্যে যে সব ঘটনা ঘটেছিল তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিলেন। পাণ্ডু তখন কয়েকজন সশস্ত্র অনুচর সঙ্গে নিয়ে দম্ভাদলপতি যেখানে গুহার মধ্যে তার ধন সম্পদ লুকিয়ে রেখেছিল, সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন, এবং সে সব উদ্ধার করলেন। কাছেই তারা সেই মৃত দম্ভাদলপতির এবং তার নিহত অনুচরদের দেহাবশেষ দেখতে পেলেন। তখন তারা যথোচিত মর্যাদার সঙ্গে সেই মৃতদেহগুলি একত্র স্তুপীকৃত করে সৎকার করলেন।

একটি পাত্রে ভস্মরাশি সংগ্রহ করে সেটি একটি গর্তের মধ্যে রেখে তার উপর একখানি পাথর চাপা দেওয়া হল, পাথরটির গায়ে পশ্চকের লেখা একটি লিপি উৎকীর্ণ করা হল, যাতে মহাদূতের ধর্মাস্ত্রের গ্রহণের কাহিনী লিপিবদ্ধ করে রাখা হল।

পাণ্ডু ও তার অনুচরেরা ফিরে যাবার পূর্ব মুহূর্তে পশ্চক সেই সমাধিক্ষেত্রে একটি প্রার্থনা সভায় ভগবান তথাগতের উপদেশের মর্ম ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কর্মের নিগূঢ় রহস্য সকলকে বুঝিয়ে দিলেন। ভগবান বুদ্ধ বলেছেন—

“আমরা নিজেরাই অশুভ কর্ম করে থাকি।

আমরাই দুঃখস্বপ্না ভোগ করি
 আবার আমরাই আপনা থেকে অন্তঃকরণে নিবৃত্ত হই
 আমরা নিজের থেকেই বিস্তৃত হই
 আমরা ছাড়া আর কেউই আমাদের উদ্ধার করে না
 করবার শক্তিও কারো নেই, নেই সে রকম কোনো সম্ভাবনা
 আমরাই নিঃসঙ্গভাবে সেই পথে এগিয়ে যাব
 বুদ্ধগণ কেবল সেই পথ আমাদের দেখিয়ে দেন "

শ্রমণ বললেন—“আমাদের যে কর্ম, তা কোনো ঈশ্বর বা ব্রহ্ম
 বা ইন্দ্র, বা অণু কোনো দেবতার সৃষ্টি নয় আমাদের কর্ম
 আমাদের কৃতকার্যেরই ফলমাত্র। আমার অনুষ্ঠিত কার্যই তার
 গর্ভে আমাকে ধারণ করে রয়েছে। সেই কৃতকর্মের উত্তরাধিকার
 নিয়েই আমি জন্মেছি। এ যেমন আমার অনুষ্ঠিত দুষ্কৃতির
 অভিষাপ, তেমনি সুকৃতিরও আশীর্বাদ। আমার কৃতকর্মের প্রবাহই
 আমার একমাত্র সম্বল, যার সাহায্য আমি আমার নিজের মুক্তি
 সাধন করতে পারি।”

কিছুক্ষণ ধেমে শ্রমণ আবার বলতে লাগলেন—

“যদিও প্রত্যেকেই নিজের নিজের কর্মের স্রষ্টা এবং আমরা যে
 রকম কর্মবাজ রোপণ করে থাকি, তদনুরূপ ফলও পেয়ে থাকি, তবু
 যারা অধর্মাচরণ করে থাকে তাদের অনুষ্ঠিত অধর্মের জগ্গেও আমাদের
 প্রত্যেকেরই সমান দায়িত্ব আছে। কর্মজাল পরস্পর এমনই সম্বন্ধ
 যে একজনের ভ্রান্তি অণু সকলের ভ্রান্তিরই প্রতিধ্বনি মাত্র।
 আমাদের ব্যর্থতার অভিষাপই বল, বা সত্যতার পরম নিবৃত্তিই
 বল, কোনটাই একলার জগ্গে নয়। তাই যখনই আমরা অসৎ,
 পাপাচারী, অপরাধীর বিচার করে থাকি, তখন যেন তারা আমাদের
 সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত না হয়, কেননা তাদের অপরাধে আমাদেরও
 অংশ আছে।”

পার্ব্বতী গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের কাছে সেই সমাধিক্ষেত্রটি “ধর্মাস্তুরিত দম্ভ্যর সমাধি” বলে পরিচিত হয়ে উঠল। কালক্রমে সেখানে একটি মন্দির তৈরী হল, যেখানে পথশ্রান্ত যাত্রীরা বিশ্রাম পেতে পারে এবং দম্ভ্য ও তক্ষররা যাতে (ভগবান তথাগতের) সন্ধর্মে দীক্ষিত হতে পারে, তার জন্তে ভগবান বুদ্ধের উদ্দেশে প্রার্থনা করতে পারে।



সংকর্মের পরিণাম

পাণ্ডু তাঁর সব ধনসম্পদ কৌশাস্থীতে নিয়ে গেলেন। তিনি বিবেচনার সঙ্গে তাঁর অপ্রত্যাশিতভাবে লব্ধ লুপ্ত ঐশ্ব্যের সদ্ব্যবহার করতে লাগলেন, যার ফলে তাঁর ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি আগের থেকে অনেক গুণে বেড়ে গেল। যখন তাঁর মৃত্যুকাল সমাগত হল পুত্র, কন্যা, পৌত্র প্রভৃতি সকলকে তাঁর শয্যার কাছে ডেকে পাঠালেন এবং তাদের উদ্দেশে বলতে লাগলেন—

“হে আমার প্রিয় সন্তানগণ, তোমরা যদি জীবনে সাফল্য লাভ করতে না পার, তবে তার জন্তু অপরের দোষ দিও না। তোমাদের নিজেদের মধ্যেই তোমাদের ব্যর্থতার কারণ খুঁজে বার করবার চেষ্টা কর। যদি না তোমাদের দৃষ্টি মোহান্বিত হয়, তবে নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের নিজেদের দোষ খুঁজে পাবে, এবং তখন তার থেকে নিজস্ব হবার পথ খুঁজে বার করাও তোমাদের পক্ষে সম্ভব হবে। তোমাদের অমঙ্গলের প্রতিকারও তোমাদের নিজেদের মধ্যেই রয়েছে। কখনও তোমাদের স্বচ্ছদৃষ্টি যেন স্বার্থ চিন্তার ধূলিজালে আচ্ছন্ন না হয়। আর সর্বদাই একটি কথা মনে রেখো যা আমার নিজের জীবনে রক্ষা কবচের মত কাজ করেছে—

‘যে পরকে আঘাত করে

সে শুধু নিজেকেই বিক্ষত করে থাকে।

যে অপরকে সাহায্য করে

সে বেশী করে নিজেরই সাহায্য করে থাকে ॥

তোমাদের মন থেকে



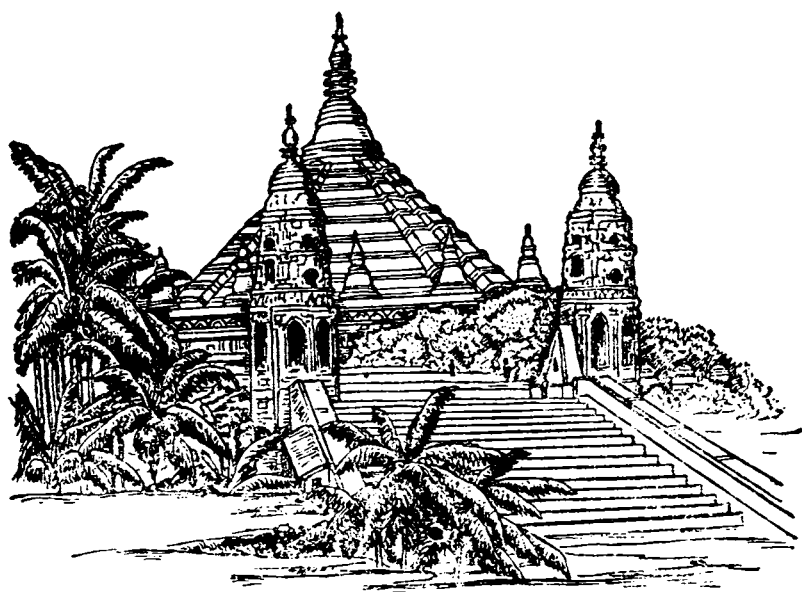
যেন অহমিকার অঙ্ককার দূর হয় ।

তা' হলে নিশ্চয়ই তোমাদের নিজের পথ খুঁজে পাবে ।

তোমাদের চলবার পথ তোমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে ॥'

“যদি আমার একটি কথা তোমরা মনে রাখ, এবং সেইমত

জীবনে কাজ কর, তবে দেখবে, যে ইহজীবনের অবসানে তোমাদের সঞ্চিত সংকর্মের মধ্যেই তোমরা বেঁচে থাকবে, এবং তোমাদের আত্মা তোমাদের অমুক্তিত কর্মানুসারে অমরত্বের অধিকারী হতে পারবে।”



পূর্বাভাষ

শাক্যমুনি ভগবান তথাগত বুদ্ধ তখনও সশরীরে পৃথিবীতলে বিচরণ করছেন। সমগ্র গান্ধেয় উপত্যকায় এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল। প্রত্যেকটি অধিবাসীই তার বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলেই সানন্দে তাকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রশ্ন করে : “শুভ সংবাদ শুনেছ কি বন্ধু!—ভগবান সম্যক্ সম্বুদ্ধ, দেব ও মানবের শাস্তা, রক্তমাংসের দেহ ধারণ করে আমাদের মধ্যে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং আমাদেরই মধ্যে বিচরণ করে বেড়াচ্ছেন? তাঁর দর্শন আমি পেয়েছি—তাঁর ধর্মমতকে আমি শরণরূপে গ্রহণ করেছি। তুমিও যাও বন্ধু, তাঁর অপূর্ব মহিমায় তাঁকে প্রত্যক্ষ কর। উদয়কালীন সূর্যের মতো তাঁর সুন্দর মুখমণ্ডল! সত্তা গুহা থেকে নিষ্ক্রান্ত তরুণ সিংহের মতো তাঁর দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ আকৃতি! আর যখন ভগবান তথাগত ধর্মোপদেশনার জন্তে মুখ খোলেন, তখন তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী সংগীতের মত মনে হয়। যে-কেউ তাঁর উপদেশ শুনুন না কেন, তাঁকে বিশ্বাস না করে তার কোনো উপায়ই নেই। মগধ, কোশল এবং অত্যাশ্র বহু জনপদের অধিপতিরা তাঁর কণ্ঠস্বর শুনেছেন, তাঁকে অভ্যর্থনা করেছেন, তাঁর শিষ্য বলে নিজেদের পরিচয় দিচ্ছেন। তিনি বিশ্বের রহস্যের সমাধান করতে পেরেছেন, আর আমাদের অস্তিত্বের সমস্যার গূঢ় রহস্যের সন্ধানও তিনি পেয়েছেন। জীবন দুঃখময়—এই তাঁর দেশনা। কিন্তু এই দুঃখের কারণ (বা উদ্ভব) এবং তার থেকে

মুক্তিলাভের উপায়ও তিনি জানেন। তিনি তাঁর শিষ্যদের এই বলে
আশ্বাস দেন যে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গে বিচরণ করলেই শুধু নির্বাণ-
লাভের অধিকারী হওয়া যায়।”

ব্রাহ্মণ তরুণ কৃষক সুদত্ত

কুছুরঘর^১—অবন্তীর একটি ছোট শহর। সে-দিন সেখানকার এক কৃষিক্ষেত্রে সুদত্ত নামে এক দীর্ঘকায় ব্রাহ্মণ তরুণ লাঙল দিয়ে জমি চাষ করছিল। জমির মালিকের নাম ছিল সুভূতি। লোকে তাকে তার বিভবের জন্তে ডাকত মহাসুভূতি বলে। সেখানকার রাজা তাকে গ্রামের প্রধানরূপে নিয়োগ করেছিলেন। গ্রামের লোকদের বিষয়সম্পত্তি নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা তাছাড়া অগ্রসব দণ্ডনীয় ফৌজদারী অপরাধের বিচারের ভারও তারই ওপর ছিল।

সুদত্ত জমি চাষ করতে করতে মাঝে মাঝে আনন্দে গেয়ে উঠছিল। তার আনন্দের কারণও ছিল—কেননা মহাসুভূতি তাকে তাঁর জামাতারূপে নির্বাচন করেছিল। তখনকার দিনের প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী বিবাহের আগে বরকে ভাবী-কনের সামনে চারটি মাটির তাল সাজিয়ে রাখতে হত। সুদত্তও সেইমত তার ভাবী বধূর সামনে চারটি মাটির তাল এনে রেখেছিল—একটির মধ্যে ছিল শস্ত্রবীজ, আর একটির মধ্যে ছিল গোশালার নানারকম জিনিস, আর একটি তাল আনা হয়েছিল শ্মশান থেকে, চতুর্থটির মধ্যে ছিল যজ্ঞবেদীর কিছু ধূলো। মহাসুভূতির কণ্ঠ্য কিন্তু শ্মশানমৃত্তিকার তাল স্পর্শ না করে (তাহলে সেটা অশুভসূচক হত) যজ্ঞবেদীর

বুদ্ধঘোষ এবং আরও অনেকে ‘কুছুরঘর’ নামের উল্লেখ করেছেন। তবে মহাবঙ্গ (৫-ম, ১০) আছে ‘কুরঘর’।

খুলো যে মৃৎপিণ্ডের মধ্যে ছিল সেটিকেই স্পর্শ করেছিল। তার দ্বারা এটাই সূচিত হয়েছিল যে তার সম্ভাবনা হবে প্রসিদ্ধ ঋষিক বা যজ্ঞমান। সুদন্তের ধারণা হয়েছিল—এর থেকে অভীষ্ট ও গৌরবময় সৌভাগ্য আর কিই বা হতে পারে? প্রচুর শস্য সঞ্চয় বা পশুপালন থেকে উপার্জিত সম্পদ নিঃসন্দেহে আশীর্বাদস্বরূপ। কিন্তু ধর্মামুষ্ঠান থেকে যে আনন্দ পাওয়া যায়, তার সঙ্গে বৈষয়িক ভোগস্বখের তুলনা কি সম্ভব? এই কথা মনে চিন্তা করেই সুদন্ত মাঝে মাঝে আনন্দে গেয়ে উঠছিল। অমিতবলশালী স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র সোমপান করে যে রকম তৃপ্ত হন, সুদন্তও ঠিক সেই তৃপ্তিই অনুভব করছিল।

হঠাৎ জমি চষতে চষতে লাঙলের ফলাটি একটি খরগোশের বাসার মধ্যে ঢুকে গেল। আর সেই মুহূর্তে খরগোশটিও পালাবার জন্তে লাফিয়ে উঠল। কিন্তু পালাতে গিয়ে তার ছোট ছোট বাচ্চাগুলোর কথা মনে পড়ে যাওয়ায় সে পিছন ফিরে টংকঠা ভরে তাদের দিকে তাকাতে লাগল। সুদন্তও গরু তাড়াবার লাঠি উচিয়ে খরগোশটির পিছু পিছু ছুটতে লাগল তাকে মারবার জন্তে। সে হয়ত তাকে মেরে ফেলতেও পারত যদি না হঠাৎ একজনের কণ্ঠস্বরে সে বাধা পেত—লোকটি বড় রাস্তা দিয়ে হেটে চলেছিল। সে সুদন্তকে দেখে চৈঁচিয়ে বলে উঠল: “বন্ধু, থাম। বেচারী খরগোশটি কি অন্ডায় করেছে?” তার ডাক শুনে সুদন্ত থমকে দাঁড়াল ও বলে উঠলো—“খরগোশটি কিছুই অন্ডায় করেনি বটে কিন্তু সে আমার প্রভুর জমিতে বসবাস করে, এই যা তার অপরাধ”।

অপরিচিত লোকটির আকৃতি ছিল ধীর, গম্ভীর। তাঁর মুণ্ডিত মস্তক দেখে বুঝতে পারা যাচ্ছিল যে তিনি ছিলেন একজন শ্রমণ, বৌদ্ধ ভিক্ষু, যিনি মুক্তির জন্তে গৃহত্যাগ করেছিলেন। তাঁর নাম ছিল অনুরুদ্ধ—ভগবান তথাগতের শিষ্য। সুদন্তের মুখের উদার সরল ভাব ও তার আকৃতির সৌন্দর্য দেখে অনুরুদ্ধ তাকে অভিবাদন

ফরলেন। ব্রাহ্মণ কিশোরের অস্থায় আচরণকে লক্ষ্য করে দেবার দৃষ্টিই যেন ভ্রমণ তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন—“বোধ হয় খরগোশটির মাংস খাবার জন্যে তোমার ইচ্ছা হয়েছে?”



“না, না,” সুদত্ত বলে উঠল, “তা নয়। তাছাড়া এখন বাচ্চা পাড়বার সময়, এখন খরগোশের মাংস খাবার মতন নয়। আমি

শুধু শুধু খেলার ছলেই তাকে তাড়া করেছিলাম এয়া এত ক্রিপ্রগতি যে খুব কমবয়সী ছেলেরাও এদের সঙ্গে লেঠ পেয়ে উঠে না”।

তখন অনুরুদ্ধ বললেন, “বন্ধু, তুমি নিজেকে একবার পিতা বলে ভাব দিকি ! মনে কর যেন কোনো ভীষণাকৃতি দৈত্য পিতার কাছ থেকে তার শিশুদের ছিনিয়ে নিয়ে গেছে, যাকে সে মেরে ফেলার জন্তে উত্তত হয়েছে, যেমন তুমি ঐ বেচারার স্বরগোশটিকে মেরে ফেলতে চাইছিলে”।

শুদন্ত উত্তর দিল, “আমি তাহলে তার সঙ্গে যুদ্ধ করতাম—সে যদি শেষ পর্যন্ত আমাকে হত্যা করত, তা হলেও।”

শ্রমণ তাকে সম্বোধন করে বললেন, “তুমি খুবই সাহসী দেখছি। কিন্তু মনে কর, সে দৈত্যটি যদি তোমার সব প্রিয়জনকে হত্যা করে তোমার বাবা, মা, তোমার স্ত্রী, পুত্রকন্যা সকলকে ? কেবল তোমাকে ছেড়ে দিত, আর তোমার দুর্দশা নিয়ে কেবলই বিক্রপ করত—তবে তুমি কি করত ?”

তরুণ ব্রাহ্মণ শুদন্ত সলজ্জ বদনে দাঁড়িয়ে রইল। তার মনে কখনও এ জাতীয় চিন্তার উদয় হয়নি। সে কখনও নিজের চেয়ে দুর্বলতর কোনো প্রাণী নিয়ে চিন্তা করেনি ; এমন কি নিছক আশ্রমোদের জন্তে অগ্নিকে আঘাত করে যন্ত্রণা দিতেও সে ইতস্তস্ত করত না। সে ছিল উদারচিত্ত, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, সর্বদাই নতুন কিছু করবার জন্তে উৎসাহী—অথচ তার একটি বিষয়ে অভাব ছিল।

অনুরুদ্ধ নিজের মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন : এই তরুণটির স্বভাব অতি উদার ; কিন্তু তার বুদ্ধি ঠিক ভাবে পরিচালিত হয়নি। যদি তাকে যথাযথ উপদেশ না দেওয়া যায়, তবে উৎসাহের আতিশয্য তার প্রচুর ক্ষতি করবে। হায় ! সে যদি ভগবান তথাগতের ধর্মের মর্ম ঠিক মত গ্রহণ করতে পারে ! এ ধর্ম ভাষায় ও ভাবে কতই না মহান, এর ভিত্তি কতই না সত্য ও দৃঢ় ; ভগবান

তথাগতের মতবাদ সূর্যালোকের মতই উজ্জ্বল। আর ব্যাবহারিক প্রয়োগের দিক দিয়েও অমুরূপ মহিমাযিত।” সুদত্তকে সম্বোধন করে তিনি বললেন : “বন্ধু ! তুমি কি জীবের প্রতি কেমন ব্যবহার করতে হয়—সে বিষয়ে ভগবান তথাগতের উপদেশ শোন নি ? তিনি বলেছেন—

‘মৈত্রীর দ্বারা বিশ্বকে ব্যাপ্ত কর ;

যে কোন জীব সে নিরীহই হোক বা ক্রুরই হোক—

যেন এমন কিছু না করে যাতে তাদের ক্ষতি হতে পারে ;

তবেই তারা যথার্থ শান্তির পথের সন্ধান পাবে।’

—চুল্লবগ্গ, ৫-ম, ৬

“এই ধরণোশটি পৃথিবীর অন্য সব প্রাণীর মতই, তোমারই মত যাবতীয় ভাব মনের মধ্যে অনুভব ক’রে থাকে। তোমারই মত সেও দুঃখ, জরা ও মৃত্যুর বশবর্তী। তোমার স্বাস্থ্য ও শক্তি সব সময়েই একই রকম ছিল না। বছ বৎসর আগে তুমি ছিলে একটি অসহায় ক্ষুদ্র শিশু—যদি না সে সময় তোমার মাতার স্নেহে যত্ন ও পিতার রক্ষণাবেক্ষণ তুমি পেতে, তাহলে তোমার পক্ষে জীবন ধারণ করাই সম্ভব হত না। তুমি শুধু তোমার বর্তমান অবস্থার কথাই চিন্তা করছ—কিন্তু অতীতের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছ। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও তোমার কোনও চিন্তা নেই। এখন যেমন তুমি মাতৃকোড়ে তোমার শৈশবের দিনগুলির কথা মনে করতে পার না, মাতৃ-জঠরের নিরাপদ আশ্রয়ে তুমি যখন রক্ষিত ছিলে সে সময়ের কথা যেমন তোমার জ্ঞানের অগোচর, ঠিক সেইভাবেই পূর্ব পূর্ব জন্মের কোনও কথাই আর তোমার মনে পড়ে না—অথচ তার মধ্য দিয়েই তোমার ব্যক্তিত্বের ক্রম বিকাশ হ’তে হ’তে বর্তমান অবস্থায় তুমি উত্তীর্ণ হয়েছ।”

“হে মহাশ্রমণ”, সেই ব্রাহ্মণ তরুণ বলে উঠল, “আপনিই যথার্থ দেশক। আমি আপনার উপদেশ পেতে চাই।”

শ্রমণ তখন বলতে লাগলেন, “ভগবান তথাগতও ঠিক একই ভাবে পর পর অবিচ্ছিন্ন ধারায় জীবনের বিভিন্ন অবস্থা অতিক্রম করেছিলেন। তব্ধচিন্তা, আত্মসংযম ও করুণার দ্বারা তিনি তাঁর চিন্তকে এমনভাবে গড়ে তুলেছিলেন যে তিনি ক্রমশঃ উন্নত থেকে উন্নততর পর্যায়ে উন্নীত হতে হতে পরিণামে বোধিলাভের দ্বারা সম্যক্ সম্বুদ্ধ হতে পেরেছিলেন এবং নির্বাণ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। বহু যুগ পূর্বে তাঁর এই পার্শ্বিক জীবনের সূত্রপাত হয়েছিল অতি নগণ্য পরিবেশে- দারিদ্র্য ও অশক্তির মধ্যে। মাছ হয়ে তাঁকে সমুদ্রে ভেসে বেড়াতে হয়েছিল, পাখী হয়ে তিনি বৃক্ষের শাখায় শাখায় বাসা বেঁধেছেন। আর তাঁর কর্ম অনুসারে তিনি জীবন-ধারার এক পর্যায়ে থেকে আর এক পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হয়েছেন। শোনা যায় যে, এক সময় তিনি শশকরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন— মাঠে মাঠে ঘুরে কোনো প্রকারে তাঁর জীবিকা নির্বাহ করতে হয়েছিল। তুমি কি কখনও সে কাহিনী শোন নি?” ।

সুদত্ত উদ্‌গ্ৰীব হয়ে উত্তর দিলে, “কই না ত’! অনুগ্রহ করে আমাকে তা বলুন।”

শশকের কাহিনী ১

অনুরুদ্ধ তখন বলতে শুরু করলেন :

“শোনা যায় বোধিসত্ত্ব কোনো এক সময়ে এক উর্বর দেশে শশকরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সেখানকার কৃষিক্ষেত্রে তিনি সপরিবারে বাস করতেন। ক্রমশঃ শশকদের বংশ এত দ্রুত বৃদ্ধি পেতে লাগল যে খাদ্যাভাব দেখা দিল ও অধিবাসীরা তাদের উপদ্রব বলে মনে করতে লাগল।

“তখন বোধিসত্ত্ব—যিনি শশক হয়ে জন্মেছিলেন, মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন : বড়ই দুঃসময় উপস্থিত হয়েছে। অধিবাসীরা চাল, গম প্রভৃতি খাত্তের অভাবে বড়ই কষ্ট পাচ্ছে। সুতরাং তারা ক্রমেই রুষ্ট হয়ে উঠবে আর এ অঞ্চলের সব শশককেই হত্যা করবে। ফলে আমাকেও তাদের কবলে পড়তে হবে। আমার এই বর্তমান জন্ম ব্যর্থ না হয়? আমি ত’ অতি তুচ্ছ দুর্বল জীব, আমার জীবনেরও কোনো মূল্য নেই, যদি না এর দ্বারা আমি এমন কিছু কাজ করতে পারি যার ফলে সম্যক্ জ্ঞান লাভের পথ কিছুটা সুগম হতে পারে। আর এই সম্যক্ জ্ঞানই মৃত্যুহীন নির্বাণের পরম শাস্তি লাভের একমাত্র পথ। অতএব আমি নির্বাণের অন্বেষণেই নিজেকে নিয়োগ করব। এ জগতে

অবশ্যই ধর্মের কার্যকারিতা আছে; সত্য নিরর্থক নয়। বুদ্ধত্ব প্রাপ্তিও সম্ভব। আর যারা ঐকান্তিক মনন এবং সংকর্মের দ্বারা বুদ্ধত্ব লাভ করেছেন, তাঁরাই কেবল অপরকে মুক্তি লাভের পথ দেখাতে পারেন। যারা বুদ্ধ, তাঁদের অন্তঃকরণ সর্বদাই তত্ত্বজ্ঞান ও করুণায় পূর্ণ, তাঁদের হৃদয়ে অনন্ত দয়া, তাঁদের চুঃখও নিরবধি। জীবিত সকল প্রাণীর প্রতিই তাঁদের প্রীতিপূর্ণ হৃদয় ধাবিত হয়ে থাকে। আমি তাঁদেরই অনুসরণ করব। যাতে করে ক্রমে ক্রমে আমি তাঁদের সমান হয়ে উঠতে পারি। সত্য সর্বদাই এক, এবং এ বিশ্বে কেবল একটি মাত্রই শাস্ত্র ও যথার্থ ধর্ম আছে। সুতরাং বুদ্ধকে নিরন্তর ধ্যান করে এবং আমার অন্তরের অবিচল বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে আমার পক্ষে উচিত হবে এমন কোন সংকর্ম করা যার সাহায্যে জগতে মঙ্গলের অভ্যুদয় হবে এবং চুঃখভার হ্রাস পাবে।

“এই ভাবে মুক্তিমार्গের কথা চিন্তা করে, সেই শশক তার সঙ্গী অগ্ন্যাগ্ন শশকদের ভারী বিপদ সম্বন্ধে সতর্ক করে দেবার জগ্ন্য মনঃস্থির করল। সে তাদের এই জীবনের অনিত্যতা এবং মিতব্যয় ও সংযমের উপকারিতা সম্বন্ধে উপদেশ দেবার জগ্ন্যে কৃতসঙ্কল্প হল।

“বোধিসত্ত্ব (শশক) তখন তার অগ্ন্যাগ্ন সঙ্গী শশকদের কাছে গিয়ে তাদের ধর্মোপদেশ দিতে লাগল। কিন্তু কেউই তাঁর কথায় কাণ দিলে না। তারা বললে—‘ওহে ভাই, তুমি ত’ বোধিসত্ত্ব। যাও, তুমিই প্রথমে কোনো সংকাজ করে দেখাও। যাও না, সত্যের জগ্ন্যে তুমিই নিজেকে উৎসর্গ কর না কেন! অগ্ন্যে যাতে বাঁচতে পারে তার জগ্ন্যে তুমি নিজেকেই মৃত্যু বরণ কর—হয়ত’ তাতে ভবিষ্যতে কোনো উন্নততর জীবন তুমি লাভ করতে পারবে। আমাদের উপদেশ দিয়ে মিছিমিছি বিরক্ত করে কি লাভ? আমরা বাঁচতে চাই, জীবনকে ভালবাসি, সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করে আমরা

আনন্দ পেয়ে থাকি—এইটিই খাঁটি সত্য। তত্ত্বজ্ঞান প্রচার এবং তার থেকে যে শাস্তি পাওয়া যায়—সে ত' শুধু কল্লনা মাত্র। ক্ষেতের মধ্যে আমাদের খাবার মত কত রকম গম, কড়াই, চাল, সুমিষ্ট ফল প্রচুর পরিমাণেই আছে। আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে তোমার মাথাব্যথা করবার কোনো দরকার নেই। প্রত্যেকেই তার নিজের পথ বেছে নিতে পারবে।'

“সেই সময়ে বনের মধ্যে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন—নির্বাপলাভের জন্তে নির্জনে ধ্যান করাই ছিল তাঁর ব্রত। ব্রাহ্মণ ক্ষুধায় ও শীতে খুবই কাতর হয়ে পড়লেন। মাঝে বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার ফলে কনকনে শীত পড়েছিল—ব্রাহ্মণ নিজেকে উত্তপ্ত করবার জন্তে আগুন জ্বলে, তাতে হাত গরম করতে করতে নিজের ভাগ্যকে ধিকার দিচ্ছিলেন, ‘আমার ধ্যান সম্পূর্ণ হবার আগেই হয়ত উপবাসে আমাকে মরতে হবে—কেন না, আমার হাতে খাবার মত কিছুই আর নেই।’

“বোধিসত্ত্ব (শশক) সেই ব্রাহ্মণের অভাব দেখতে পেয়ে নিজের মনে বলতে লাগল : ‘ব্রাহ্মণকে কিছুতেই মরতে দেওয়া যায় না—কেন না, তাঁর প্রজা অজ্ঞানান্ধকারে হাতড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এমন বহুলোকের কাছে আলোকসুস্তের মত কাজ করবে! আমিই বরং তাঁর ক্ষুধা নিবারণের জন্তে নিজেকে ভোজ্যরূপে উৎসর্গ করি না কেন?’ এই কথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বোধিসত্ত্ব প্রজ্বলিত অগ্নির মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল যাতে ব্রাহ্মণ তার মাংস খেতে পারেন। এই ভাবে সে অনশনে মৃত্যুর হাত থেকে ব্রাহ্মণকে রক্ষা করল।

“কিছুদিনের মধ্যেই সেই অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে হুর্ভিক্ষ ভয় উপস্থিত হল। তারা হুর্ভিক্ষের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্তে খাতের সন্ধানে দল বেঁধে চারদিকে বেরিয়ে পড়ল। এই ভাবে তারা শশকদের তাড়া ক’রে একটা ছোট ঘেরা জায়গার মধ্যে

তাদের জড় করল। শেষ পর্যন্ত এক দিনেই হাজার শশক তাদের
প্রহারে মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হল।”



নির্বাণ কি ?

শ্রমণ অমুরুদ্ধ শশকের কাহিনী শেষ করে ব্রাহ্মণ তরুণ সুদন্তকে উদ্দেশ্য করে বললেন : “জন্ম মানেই মৃত্যু। একবার শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করেছে এমন কোনো প্রাণীরই মৃত্যুর কবল থেকে নিস্তার নেই। বিভিন্ন উপাদানের সংহতি থেকে উৎপন্ন বস্তু মাত্রেরই বিনাশ অবশ্যস্বাবী। কিন্তু সংকর্মের কখনও মৃত্যু নেই। সংকর্ম চিরস্থায়ী। এই হচ্ছে অভিধর্মের মূলকথা। মৃত্যুর অধিকারকে যে মৃত্যুর হাতেই সমর্পণ করে, সেই কেবল শাস্বত জীবনের অধিকারী হয়ে থাকে এবং পবন কল্যাণের আকর নির্বাণ অবস্থা প্রাপ্ত হয়।”

ব্রাহ্মণ তরুণ প্রশ্ন করল : “নির্বাণ কি ?”

অমুরুদ্ধ তখন ভগবান তথাগতের বাণী উদ্ধার করে বললেন :

“যখন বাসনার বহি নির্বাণিত হয়ে থাকে,

তখন নির্বাণ লাভ সম্ভব হয়।

যখন ঘৃণা এবং মোহের প্রদীপ্ত শিখা

উপশাস্ত হয়, তখনই নির্বাণ লাভ হয়ে থাকে।

যখন চিত্তের অশাস্ত ব্যাকুলতা, যার মূলে আছে

অহঙ্কার, অন্ধ বিশ্বাস এবং নানাবিধ কলুষ,

উচ্ছিন্ন হয়, তখনই নির্বাণ আয়ত্ত হয়ে থাকে ॥”

তরুণটির মুখের ভাব দেখে বুঝতে পারা যাচ্ছিল যে সে এই নতুন মতবাদে সন্তুষ্ট হতে পারে নি। তাই অমুরুদ্ধ আবার বলতে

লাগলেন : “যে আত্মা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণাকে আঁকড়ে থাকে, তার পক্ষে নির্বাণের মাধুর্য আশ্বাদন করা ত দূরের কথা, বুঝে ওঠাও কঠিন। জাগতিক যাবতীয় বস্তুই নশ্বর, ক্ষণস্থায়ী। সংহত পদার্থমাত্রেরই উৎপত্তি আছে এবং শেষ পর্যন্ত তাদের লয়ও আছে। আমাদের এই শরীরবদ্ধ অস্তিত্বের মধ্যে কিছুই স্থায়ী নয়। দৃশ্যমান পদার্থমাত্রই কারণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং প্রতিটি প্রাণীই ক্রম বিবর্তনের স্বাভাবিক পথেই আত্মলাভ করে থাকে—তার অতীত ইতিহাস যে সব কারণকলাপের দ্বারা নিরূপিত হয়েছে, তদনুসারেই। অস্তিত্বের যাবতীয় উপাদান সবই ক্ষণভঙ্গুর, নিয়ত পরিবর্তনশীল। এমন কোন পদার্থ কল্পনাই করা যায় না, যাকে শাস্ত্রত আত্মা বলে নির্দেশ করতে পারা যায়। যার কোনো মৃত্যু নেই, যা কোনদিনই নিজের স্বরূপ থেকে বিচ্যুত হবে না। সুতরাং তাকে জ্ঞানবার জগ্গেই চেষ্টা করা উচিত, যা নিজের স্বভাব থেকে কখনো বিচ্যুত হবে না, যা শাস্ত্রত, যা সম্পূর্ণরূপে অপরিবর্তনীয় ও কূটস্থ। যা কোনো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মূর্ত তত্ত্ব নয়, যার সঙ্গে কোনো প্রকার জড় শরীরের কোন যোগই নেই, যার কোনো ব্যক্তিগত (individual) স্বতন্ত্র সত্তা নেই। মোট কথা যাকে কোনো ভাবেই আত্মা বলে নির্দেশ করা সম্ভব নয়—অথচ এ রকম পদার্থ যে নেই তা নয়—অবশ্য আছে। সেই পদার্থ মৃত্যুহীন, শাস্ত্রত, কূটস্থ, অপরিণামী। জগতের যাবতীয় পদার্থের মধ্যে কেবলমাত্র সেইটিই একমাত্র বাস্তব। কিন্তু তার এই বাস্তবতা আধ্যাত্মিক স্তরের, জড়জগতের নয়। সে পদার্থটি তবে কি? তার নাম ‘বোধি’ যা মৃত্যুহীন, যা সর্বব্যাপী, অপরিণামী ও শাস্ত্রত। যে সব তত্ত্ব চিরকাল আপন স্বভাব থেকে প্রচ্যুত হয় না, সে সব তত্ত্বের সামঞ্জস্য ও সংগতি এই বোধির মধ্যেই সম্ভব হয়ে থাকে। বিজ্ঞানীরা যে সব তত্ত্বের উপর নির্ভর করে নিজেদের মধ্যে বাকবিতণ্ডা করে থাকেন, তাদের কোনোটিই কিন্তু স্বলক্ষণ (particular) পদার্থমাত্র নয়, তাদের কোনো স্বতন্ত্র

বাস্তবতা নেই ; তারা কোনো মূর্ত পদার্থও নয়। তাদের কোনো প্রকারেই ‘আত্মা’ বলে নির্দেশ করা সম্ভব নয়। তারা দেবতাও নয়, কিংবা কোনো চেতন জীবও নয়। তারা ‘অবস্থ’, ‘শূণ্য’—যদি অবস্থ বলতে আমরা এমন কোনো তত্ত্ব বুঝি যার কোনো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অস্তিত্ব নেই বা যার কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব নেই। অথচ তাদের এই ‘অবস্থ’ অস্তিত্ববিরোধী হয়, বা অভাবাত্মক হয়। যদি সেই অমর, শাস্ত্রত, অপরিণামী তত্ত্ব একেবারেই ‘অসৎ’ হত, তাহলে এই জগতের দুঃখজাল থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া কোনো প্রকারেই সম্ভব হয়ে উঠত না। যদি ‘বোধি’ সম্পূর্ণরূপে ভ্রমাত্মক হত, তবে সম্যক্ জ্ঞানের কোনো সম্ভাবনাই আর থাকত না, ‘নির্বাণ’ লাভের কোনো আশাই আর থাকত না, কোনো বুদ্ধই তাহলে মুক্তির পথ দেখাবার জন্তে অবতীর্ণ হতে পারতেন না। কিন্তু বুদ্ধ ত জন্মেছেন। তিনি সম্যক্ ভাবে উপলব্ধি করেছেন যে অপরিবর্তনীয় ‘আত্মা’ সম্বন্ধে লোকের যে বিশ্বাস তার কোনো ভিত্তিই নেই। তিনিই আবিষ্কার করেছেন যে ‘আত্মা’ সম্বন্ধে এই মোহই সকল দুঃখের নিদান। এবং তিনি মুক্তিলাভের পথ দেখিয়ে দিয়েছেন, যে মুক্তি ‘বোধি’র দ্বারাই লভ্য। যারা ঐকান্তিকভাবে সেই সম্যক্ জ্ঞানের আলোক পাবার জন্তে উদ্গ্রীব তিনি তাদের আর্থ অষ্টাঙ্গিক মার্গের সাহায্যে শাস্ত্রত মহিমময় নির্বাণের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন।”

“হে মহাশ্রমণ !” সুদত্ত বললেন, “ভগবান শাক্যমুনি, যার কাছ থেকে আপনি এই সব উপদেশ লাভ করেছেন, তিনিই যে সত্যই খুব বড় ধর্মোপদেশক—আমি বেশ বুঝতে পারছি ! কিন্তু তা হলেও আমার মনে হয় না আমাদের এই কুহরঘর গ্রামে তাঁর মতের বিশেষ সমাদর হবে। কেন না এখানে আমরা সকলেই নির্ভাবান ব্রাহ্মণ, আর আমাদের মধ্যে এমন একজনও নেই যিনি বুদ্ধের মতাবলম্বী। তৎসত্ত্বেও, আমার পক্ষে আপনার কাছে

একথা গোপন করা বোধ হয় উচিত হবে না যে আমাদের গ্রামে অস্তুতঃ একজন আছেন যিনি শাক্যমুনি সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করে থাকেন। তাঁর নাম মহাসুভূতি। তিনি মহারাজ বিম্বিসারের অন্তরঙ্গ সুহৃদ এবং অঞ্চলের প্রধান গ্রামণী। যদি আপনি এই গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করেন তবে আপনি যেন তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করেন এবং তিনি নিশ্চয়ই আপনাকে সাদরে অভ্যর্থনা করবেন। তিনি যে বুদ্ধের মতের অনুবর্তী তা নয়। তবে তাঁর সঙ্গে গৌতমের ব্যক্তিগত পরিচয়, এবং সেই সূত্রে সৌহার্দ্যও আছে। কেন না রাজসভায় তাঁর সঙ্গে গৌতমের দেখা হয়েছে। তিনি বলেন : 'যদি ব্রহ্ম কখনও পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, তবে তিনি গৌতমরূপেই অবতীর্ণ হবেন। কেন না শাক্যমুনির তুলনায় ব্রহ্মের আকৃতি কখনও অধিকতর মাহাত্ম্যপূর্ণ বা দিব্যভাবমণ্ডিত হতে পারে না।' আমাদের গ্রামের প্রধান সুভূতির সঙ্গে যখন আপনার দেখা হবে, তখন আমার নামে তাঁকে অভিবাদন জানাবেন। আমার নাম সুদন্ত, আমার পিতার নাম রোজ্জ,—এবং তিনি অবশ্যই আগামী কাল তাঁর কন্যার বিবাহবাসরে উপস্থিত থাকবার জন্মে আপনাকে আমন্ত্রণ জানাবেন। আপনি এখন তবে মহাসুভূতির বাড়ীর দিকেই যান। সেখানেই আমার সঙ্গে আপনার দেখা হবে—কেননা আমিই সেই পাত্র, যার সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহ স্থির হয়ে আছে।”

ভিক্ষা-চর্যা

পাহাড়ের কোলে ব্রাহ্মণবসতি কুহরঘর গ্রাম। যখন শ্রমণ
অমুরুদ্ধ সেখানে গিয়ে পৌঁছলেন, তখন তিনি ক্ষণেকের জন্য ইতস্ততঃ
করতে লাগলেন। মনে মনে ভাবলেন : “এখন আমি কি করব ?
আমি কি প্রথমেই মহাস্থুভূতির বাড়ীর দিকে যাব, না শ্রমণসঙ্ঘের
নিয়মানুযায়ী এক গৃহদ্বার থেকে আর এক গৃহদ্বারে ভিক্ষা করতে
করতে অগ্রসর হব ?” তারপর স্থির করলেন : “ভিক্ষুদের নিয়ম
অবশ্যই পালন করা কর্তব্য। আমি প্রথমেই মহাস্থুভূতির আবাসের
দিকে যাব না। দ্বার থেকে দ্বারে ভিক্ষা করতে করতেই আমি
এগিয়ে যাব।”

গ্রামের প্রথম বাড়ীটির দ্বারদেশে উপস্থিত হয়ে শ্রমণ তাঁর
ভিক্ষার পাত্র নিয়ে ধীরভাবে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন—তাঁর
দীর্ঘদেহ স্থির, নেত্রদ্বয় আনত, বামহস্তে ভিক্ষাপাত্র। কোন লোকই
দ্বারে এল না দেখে, তাঁর শীর্ণ দেহ দিয়ে তিনি আবার এগিয়ে
চললেন। অনেকেই তাঁকে কোনো ভিক্ষা দিতে চাইল না। অনেকে
আবার রূঢ়ভাষায় তাঁকে ফিরিয়ে দিল। যে-কজন বা তাঁকে কিছু
মুষ্টিভিক্ষা দিতে এগিয়ে এল, তারাও তাঁকে বিধর্মী নাস্তিক বলে
বিদ্ৰূপ করল। কিন্তু তাঁর নিছের ব্যক্তিগত কোন বাসনাই ত
ছিল না, তাই তিনি সব দাতাকেই আশীর্বাদ করলেন। যখন
তিনি দেখলেন যে তিনি যা ভিক্ষা পেয়েছেন, তার দ্বারা তাঁর দৈহিক

নিবারণ

যাজন মিটে যাবে, তখন তিনি নিকটবর্তী অরণ্যের ঘনপল্লব
কর ছায়ায় তাঁর যৎসামান্য দৈনিক আহার ভোজনের জন্ত



ালেন। চলতে চলতে যখন তিনি গ্রামের মধ্যকার উন্মুক্ত মাঠটি
তিক্রম করছিলেন, ঠিক সেই সময় এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণের মূর্তি

সম্মিহিত পুৰসভাৰ দ্বাৰদেশে দেখতে পাওয়া গেল। ব্রাহ্মণ সেই অপরিচিত শ্রমণটির দিকে তাকিয়ে, তাঁকে দাঁড়াতে বললেন, তারপর তাঁকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন করলেন : “আপনি কি ভগবান বুদ্ধের শিষ্য ?”

“আমি অমুরুদ্ধ, ভগবান তথাগতের শিষ্য আমি”, শ্রমণ উত্তর দিলেন।

“বেশ, বেশ,” ব্রাহ্মণ বলে উঠলেন, “আপনার সঙ্গে ত আমার পরিচয় হওয়া দরকার। কেন না রাজগৃহে ভগবান তথাগতের সঙ্গে যখন আমার দেখা হয়েছিল তখন তিনি সপ্রশংসভাবে শ্রমণ অমুরুদ্ধের উল্লেখ করে বলেছিলেন যে তিনি অভিধর্ম শাস্ত্রে পারঙ্গম এবং তথাগতের ধর্মমতের নিগূঢ় রহস্য তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন। তিনি একজন প্রকৃত দার্শনিক। আপনি যদি সত্যই সেই অমুরুদ্ধ হন, তবে আমি আপনাকে আমার বাড়ীতে যাবার জ্ঞে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। অমুগ্রহ করে হে শ্রমণ, আমার বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করুন। আমার গৃহে অন্ন ও পানীয় গ্রহণ করলে আমি ধন্ত হব। আর আগামীকাল আমার কন্যার বিবাহবাসরে যদি আপনি উপস্থিত থাকতে পারেন তবে আমি অপার আনন্দ লাভ করব।”

অমুরুদ্ধ তখন উত্তর দিলেন, “হে ব্রাহ্মণ, আপনিই ত’ কুহুরঘরের গ্রামীণী। আমি যদি বনমধ্যে আমার ভোজন সমাধা করি, তবে আশা করি আপনি কিছু মনে করবেন না। তবে আমি আগামীকাল অবশ্যই আপনার কন্যার বিবাহে উপস্থিত থাকব।”

মহাসুভূতি তখন বললেন, “আপনি যেমন বলছেন, তবে তেমনই হোক। যখন আপনি আমার গৃহে আসুন না কেন, তখন স্বাগত।”

বিবাহ-সভায়

শুভূতির প্রাসাদ পতাকা ও মাণ্যে সজ্জিত করা হয়েছিল। আর তারই প্রাঙ্গণে যে অগ্নিবেদি ছিল তার উপর বাঁশ দিয়ে একটি কুটারের মত নির্মাণ করা হয়েছিল। আমন্ত্রিতদের অভ্যর্থনার জন্য। কুহরঘর গ্রামের বাসিন্দারা তাদের নিজেদের বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে বরযাত্রীদের শোভাযাত্রার জন্যে প্রতীক্ষা করতে লাগল।



ব্রাহ্মণ কিশোর সুদত্ত বরবেশে সজ্জিত হয়ে বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে উপস্থিত হল এবং সসম্মানে কন্যার পিতার গৃহ অভিমুখে এগিয়ে গেল। সেই সম্মানিত গ্রামগী ব্রাহ্মণ শুভূতিও তাকে সাদরে অভ্যর্থনা

করলেন এবং তাকে সঙ্গে করে পারিবারিক (উপাসনা) বেদির সামনে নিয়ে গেলেন যেখানে তাঁর গৃহিণী দাঁড়িয়ে ছিলেন, আর তাঁর সঙ্গে ছিল তাঁদের একমাত্র পুত্র কচ্চায়ন। সেখানে তিনি পাত্রকে মধুপর্ক দিলেন, আর তাঁর কন্যাকে উপহারস্বরূপ দিলেন বিবাহের জ্ঞাপন পরিধেয় বসন ও মূল্যবান শিরোভূষণ ও রত্নহার।

তখন পাত্রকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলতে লাগলেন, “ব্রাহ্মণ পিতা তাঁর কন্যার জন্মে, ব্রাহ্মণ পিতা ও মাতার সংপুত্রকে পাত্ররূপে নির্বাচন করবেন, ব্রাহ্মণ বিবাহের প্রথা অনুসারে তাদের বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করবেন এই হল শাস্ত্রের নির্দেশ। সুদত্ত, আমি তোমাকে পাত্ররূপে নির্বাচন করেছি কেননা তুমি আমার কন্যার যোগ্য পাত্র। তুমি সদ্ব্রাহ্মণকুলজাত তোমার দেহ সুগঠিত ও সবল। তোমার মস্তক ঘন কৃষ্ণ কেশদামে সজ্জিত, তোমার দেহত্বক্ গৌরবর্ণ ও মসৃণ, তোমার চলন সাবলীল, তোমার কণ্ঠস্বরও সুস্পষ্ট। তুমি নিয়মপূর্বক বেদাধ্যয়ন করেছ, আর তোমার চরিত্রও নির্মল। তোমার পিতা-মাতা উভয়েই গ্রামে সম্মানিত। আমার বিশ্বাস আছে যে তুমি স্বামীর কর্তব্যসমূহ যথাযথভাবে পালন করতে কিছুমাত্র বিচলিত হবেনা। আমার কন্যা হবে তোমার ধর্মপত্নী, সম্পদে ও বিপদে তোমার অনুরক্তা। আর আমি প্রার্থনা করি যে তোমার সুস্থানগণ ও তাদের ভাবী সন্তানবর্গ সকলেই পূর্বপুরুষদের যোগ্য হয়ে উঠবে। পাত্রী এখন বিবাহবেশে সজ্জিত হয়েছে মনে হয়। অতএব এস, তুমি তাকে পত্নীরূপে গ্রহণ কর। আর উভয়ে একত্রে সম্মিলিত ভাবে তোমাদের জীবনের কর্তব্যগুলি সম্পাদনে ব্রতী হও।”

বিবাহ উপলক্ষ্যে যজ্ঞানুষ্ঠানগুলি দেশের প্রচলিত রীতি অনুযায়ীই সম্পন্ন হল। গ্রামের সর্বোচ্চ পুরোহিতের মন্তোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই কন্যার পিতাও পবিত্র জল পাত্র থেকে ঢেলে দিলেন। বর কন্যার পাণিগ্রহণ করলেন, আর কন্যার সম্মুখে স্থাপিত একটি শিলাখণ্ডের ওপর আরোহণ করলেন—যার দ্বারা দৃঢ়তা বোঝান

যায়। এর পর নবদম্পতি বেদির চারদিকে সপ্তপদী প্রদক্ষিণ করলেন যাতে করে বুঝতে পারা যায় তাঁরা দুজনে সারা জীবন পরস্পর সুখদুঃখের অংশীদার হয়ে থাকবেন, এবং ভালমন্দ সব রকম ভাগ্য বিপর্যয়ই ধীর ভাবে মেনে নেবেন।

এইসব অনুষ্ঠান সমাপ্ত হবার পর নবদম্পতি বরগৃহের দিকে রওনা হল। কন্যার ভ্রাতা কচ্চায়ন, কন্যার সখীজনেরা, অভ্যাগত অতিথিরা সকলে আগে চলতে লাগল। নবদম্পতির শকটের পিছু পিছু চলতে লাগলেন এক পুরোহিত, তাঁর হাতে একটি লৌহাধার, তাতে জ্বলছিল বেদিতে প্রজ্জ্বলিত যজ্ঞাগ্নির পুত শিখা, যাতে দেবতাদের উদ্দেশে আহুতি প্রক্ষিপ্ত হয়েছিল।

বরবধূকে সঙ্গে নিয়ে শোভাযাত্রা যখন রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চলেছিল, পথের দুধারে সমবেত দর্শনার্থী জনতা বধূকে লক্ষ্য করে অক্ষত বর্ষণ করতে লাগল আর তাদের শুভ কামনা জানাতে লাগল।

বাড়ীতে পৌঁছে সুদত্ত নববধূকে নিয়ে দেহলী অতিক্রম করল। কন্যাগৃহের যজ্ঞবেদি থেকে নিয়ে আসা অগ্নিশিখা থেকে নতুন করে গার্হপত্য অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হল। তারপর নবদম্পতি সেই পবিত্র অগ্নিকে তিনবার প্রদক্ষিণ করল। এরপর তারা সামনে বিছান একটি রক্তিম গোচর্মের আসনে গিয়ে বসল। বরের বাড়ীর একটি ছোট ছেলেকে বধূর কোলে বসিয়ে দেওয়া হল, আর বরের স্বর্গত পিতার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, যিনি নিজেই ছিলেন একজন মাননীয় বৃদ্ধ পুরোহিত, বধূর জন্তে প্রার্থনা করতে লাগলেন :

“বরগৃহের যিনি রক্ষক সেই পবিত্র অগ্নি গৃহপতি তোমাকে রক্ষা করুন। তোমার সন্ততিবর্গের যেন দীর্ঘ আয়ুঃ ও নিয়ত অভ্যুদয় ঘটে। হে কল্যাণি! তুমি স্বাস্থ্যদীপ্ত পুত্রকন্যার জননী হও, এবং বীর্যবান পুত্রবর্গের সুখসন্দর্শনের সৌভাগ্য থেকে যেন বঞ্চিত না হও।”

সবশেষে বর বধূর হাতে এক মুঠো ভাজা যব দিয়ে বললেন :
 “অগ্নিদেব যেন আমাদের দেহ ও হৃদয়ের এই শুভ মিলনকে উপলক্ষ্য
 করে তাঁর অজস্র আশীর্বাদ বর্ষণ করেন।”

সুখী কে ?

বিবাহ অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হবার পর সুভূতি একদিন তাঁর অতিথিদের এক ভোজে নিমন্ত্রণ করলেন। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে শ্রমণ অনুরুদ্ধও উপস্থিত ছিলেন। সুভূতি তাঁকে তাঁর নিজের পাশে এসে বসতে বললেন। সকলকেই খুব প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল। ক্রমশঃ সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডাও পড়তে লাগল। আকাশে চাঁদ নির্মল স্নিগ্ধ দীপ্তিতে শোভা পেতে লাগল। অভ্যাগত অতিথিরা তখন এক বিশাল বটবৃক্ষের তলায় এসে বসলেন এবং দেবতাদের মহিমা ও অনুগ্রহ ও তাঁদের দেশের গৌরব নিয়ে নানা ধরনের আলোচনা করতে লাগলেন। গ্রামণী সুভূতি তখন অনুরুদ্ধকে উদ্দেশ্য করে বললেন : “হে শ্রমণ, আমি তথাগতের প্রতি, যিনি জনসাধারণের মধ্যে বুদ্ধরূপে পরিচিত, অসীম শ্রদ্ধা পোষণ করি। কিন্তু আমার ধারণা তাঁর ধর্মমত সাধারণ লোকের পক্ষে উপযুক্ত নয়। তাঁর দর্শন কেবলমাত্র তাদেরই উপযোগী যারা জীবনের নানা দুঃখে ক্লান্ত। যারা শ্রান্ত, রুগ্ন, বিষন্ন তথাগতের এই ধর্ম তাদের পরম আশ্রয় বটে। কিন্তু যারা সুখী, শক্তিমান, নীরোগ স্বাস্থ্যের অধিকারী—তাদের কাছে এই ধর্ম নিষ্ফল, ব্যর্থ। (জীবন-) সংগ্রামে যারা ক্ষত বিক্ষত তাদের কাছে এ ধর্ম পরম ভেষজস্বরূপ, কিন্তু যারা বিজয়াল্লাসে উদ্দীপ্ত এ ধর্মের প্রতি তাদের রুচি হতে পারে না।”

অনুরুদ্ধ উত্তর দিলেন : “আপনি ঠিকই বলেছেন, ভগবান

তথাগতের এই দেশনা শুধু তাদেরই জন্মে যারা জীবনের নানা দুঃখভারে পীড়িত। ক্লান্ত যারা তাদের কাছে এ ধর্ম পরম আশ্রয়-স্থল— কেননা এর সাহায্যে তারা স্বাস্থ্য ও সুখের অধিকারী হতে পারে। কিন্তু যারা নিজের থেকেই সুখী, সবল, সুস্থ—তাদের সাস্থ্যনা, সাহচর্য বা ভেষজ—কিছুরই প্রয়োজন নেই। কিন্তু সুস্থ, সবল, সুখী কারা ? আপনাদের মধ্যে এমন একজনও কি আছেন যিনি সম্পূর্ণভাবে দুঃখ, রোগ, জরা ও মৃত্যুর আক্রমণ থেকে মুক্ত ? যদি সত্যই সে রকম থাকেন, তবে তিনিই প্রকৃতপক্ষে বিজয়ী— তাঁর কাছে নতুন করে মুক্তির কোন প্রয়োজন নেই।

“এখানে আমি আমার চারদিকেই সুখের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু আপনাদের এই সুখের ভিত্তি কি খুব দৃঢ় ? যখন বিপদ, কষ্ট উপস্থিত হবে বা মৃত্যুর সময়ে আপনাদের চিন্তা প্রশান্ত ও অবিচলিত থাকতে পারবে ? তিনিই কেবল প্রকৃত সুখের সন্ধান পেয়েছেন, যিনি শাস্ত্রত নির্বাণলাভ করতে পেরেছেন—যে অবস্থায় জগতের তুচ্ছ বিষয়ভোগের প্রতি আসক্তি থেকে চিত্ত বহু উর্ধ্বে উঠতে পারে, আর আত্মার সম্বন্ধে মোহ থেকে মুক্ত হতে পারে ; জাগতিক ঐশ্বর্যজনিত যে সুখ—তা এক বিপজ্জনক অবস্থা—কেননা সকল পদার্থই পরিবর্তনশীল, আর তিনিই কেবল যথার্থ সুখী যিনি পরিবর্তনশীল পদার্থের প্রতি আসক্তি সম্পূর্ণ বর্জন করতে পেরেছেন। যে সুখ ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়—তাকে প্রকৃত সুখই বলা চলে না—এবং সে ধর্ম হচ্ছে তথাগতের প্রচারিত ধর্ম।

“তথাগত তাদের চক্ষু উন্মীলিত করে থাকেন যাদের মনে সুখী বলে অভিমান আছে—যাতে করে তারা জীবনের নানাবিধ বিপত্তি ও বাধাগুলোকে দেখতে পায়। মাছ যখন বড়শির ডগায় টোপ দেখতে পায়, তখন সে মনে করে সে সুখী, কিন্তু যখন বড়শির তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ তার মুখগহ্বরে বিদ্ধ হয় তখনই শুধু সে নিজের দুঃখ সম্বন্ধে সচেতন হয়।

“যে ব্যক্তি নিজের ব্যক্তিস্বার্থের জগৎ সর্বদাই উৎকর্ষিত, তার মনে সর্বদাই ভয়। সে হয়তঃ তার প্রতিবেশীর দুঃখ দুর্দশা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে পারে, কিন্তু সেই একই পরিণাম যে আমাদের প্রত্যেকের জন্মেই অপেক্ষা করতে পারে, একথা তাকে ভুলে গেলে চলবে না। সেই যথার্থ সুখী যে মৃত্যুর প্রাপ্য যা তা মৃত্যুকেই সমর্পণ করতে পারে। সে মৃত্যুকে জয় করেছে। তার ভাগ্যে যাই থাকুক না কেন, সে শাস্ত ও অবিচলিত থাকে। সে আত্মার সম্বন্ধে মোহ ত্যাগ করতে পেরেছে আর অমৃতলোকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে। নির্বাণ তার আয়ত্ত হয়েছে।”

সুদন্ত নববধূর দিকে চেয়ে বলল, “আমি কখনই গৌতমের ধর্মমত গ্রহণ করতে পারব না। কেননা নির্বাণ লাভের উদ্দেশ্যে সন্তোষবিবাহিত স্বামীর পক্ষে তার নব পরিণীতা পত্নীকে ত্যাগ করা কখনই সমীচীন হতে পারে না।”

অমুরুদ্ধ সুদন্তের কথাগুলি শুনতে পেয়ে বললেন, “মনে হচ্ছে, আমার তরুণ বন্ধু বোধ হয় ভীত হয়ে উঠেছেন এই ভেবে যে তথাগতের ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করলে তাকে তার নব বিবাহিত ধর্মপত্নীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হবে। কিন্তু তা ঠিক নয়। ভগবান বুদ্ধ স্ত্রী পুত্র পরিজনদের সঙ্গ ত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলেন, কারণ তিনি দেখেছিলেন জগতের চারদিক অন্ধ-কারাচ্ছন্ন। তাই তিনি নিজে নির্বাণলাভ করে জনসাধারণের কাছে সেই নির্বাণের পথ দেখাবার জন্মে ব্রতী হলেন। আমরা ধারা তাঁর শিষ্য তাঁরই মত সংসার ত্যাগ করেছি, আমরাও এই ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করেছি—আমাদের নিজেদের জন্মে নয়, কেননা আমরা সর্বপ্রকার অহংবোধ থেকে মুক্ত, কিন্তু আমাদের এই ব্রত জগতের মুক্তির জন্মে। আমাদের জীবনদর্শনকে মাত্র একটি কথায় প্রকাশ করতে পারা যায়—তা হচ্ছে ‘অনাশ্রবাদ’, যার অর্থ স্থির শাস্ত ‘আত্মা’ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার নিরসন।

“শুধু সংসারের সঙ্গে বন্ধন ছিন্ন করলেই মুক্তি হয় তা নয়, আত্মদৃষ্টির সর্বধা বর্জনই মুক্তি। যে সন্ন্যাসী সংসারের সঙ্গে সর্ববিধ বন্ধন ছেদন করেছেন, অথচ যাঁর মনের মধ্যে ক্ষীণতম বাসনার লেশমাত্রও অবশিষ্ট আছে, মনে মনে যিনি ইহজীবনে বা ভাবিজন্মে কোনো প্রকার সুখের জন্ম লালায়িত, তিনি প্রকৃতপক্ষে মুক্ত হতে পারেন নি। অপর পক্ষে যিনি সাধারণ গৃহী হয়েও সকল কামনা বর্জন করতে পেরেছেন, জীবনের মহিমাশ্রিত চরম অবস্থায় উপনীত হওয়া তার পক্ষে সম্ভব যার ফলপ্রাপ্তি ঘটে নির্বাণে।

“যিনি ধর্মপ্রচারের জন্তে ব্রত গ্রহণ করতে চান তিনি জাগতিক যাবতীয় চিন্তা পিছনে ফেলে রেখে বোধিলাভের জন্তে তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করবেন। কিন্তু পরিবারের প্রতি কর্তব্য যাঁর অসমাপ্ত, তাঁর পক্ষে গৃহস্থের দায়িত্ব পরিহার করা কিছুতেই উচিত নয়। তথাগত বলেছেন :^১

পিতা মাতা পত্নী ও সন্তানদের

পালন করো।

এই সব কর্তব্যপালন ও শাস্তিপূর্ণ

যে কোনো জীবিকার প্রতি আগ্রহই

মানব জীবনের পরম মঙ্গল ॥

সর্বজীবে মৈত্রী ও করুণা, আর আত্মীয়

পরিজনের প্রতি বন্ধুত্ব, আর নির্মল

জীবন যাপন—এই হচ্ছে প্রকৃত মঙ্গল ॥

আত্মসংযম, প্রজ্ঞা, চতুর্বিধ আর্ষসত্য,

আর নির্বাণ প্রাপ্তি—

এই হচ্ছে পরম মঙ্গল ॥”

১. মহামঙ্গল সূত্র, খুদ্দকপাঠ।

মতবিরোধ

শ্রমণ অনুরুদ্ধ লক্ষ্য করলেন যে তাঁর কথায় সুদত্ত রুষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি আর বেশী কিছু না বলে তার দিকে চেয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। সুদত্ত তখন দাঁড়িয়ে উঠে বলতে লাগল :

“আত্মাকে সম্পূর্ণভাবে বিসর্জন দেওয়া? সে আবার কি কথা? গৌতম কি এই রকম মুক্তির কথাই বলে থাকেন? আমার পিতৃদেব গৌতমকে যে নাস্তিক, ধর্মদ্রোহী বলতেন—দেখছি তাঁর কথা ষথার্থ; কেননা গৌতমের মতে যা মুক্তি তা বিনাশ বা ধ্বংস ছাড়া কিছুই না। এতে মানুষের আত্মার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ ঘটে থাকে। গৌতম শাস্ত্রের কোনো প্রামাণ্য স্বীকার করেন না। তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। আবার তিনি আত্মার অস্তিত্বও মানেন না। তিনি এতখানি ধর্মদ্রোহী যে যাগযজ্ঞকে তিনি ধর্ম-বিরুদ্ধ বলে নিন্দা করে থাকেন। ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনা তিনি নিষ্ফল বলে উপহাস করে থাকেন। আর আমাদের সভ্যতার মূলে যে সমাজব্যবস্থা, যার ভিত্তি হল পবিত্র জাতিভেদ প্রথা তাকে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত করবার জন্তে তিনি উত্তত। যাবতীয় প্রচলিত ধর্মমতের নিরাসই তাঁর ধর্মমতের বৈশিষ্ট্য, এর মূলে কোনো দৈবী প্রেরণা নেই, এ ধর্ম নিছক পৌরুষের, কেননা বেদে আত্মার স্থান এতে নেই, এখানে জীবনের ষথার্থ পথ দেখাবার পক্ষে ব্যক্তিগত প্রজ্ঞাই ষথেষ্ট।”

শ্রমণ অনুরুদ্ধ শাস্ত্রভাবে সুদন্তের তীব্র আক্রমণাত্মক মন্তব্যগুলি শুনলেন তিনি লক্ষ্য করলেন যে প্রবল উত্তেজনার বশে সুদন্তের কপোলদ্বয় আরক্ত হয়ে উঠেছে। তিনি মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন : “কি সুন্দর এই ব্রাহ্মণ কিশোরের আকৃতি ! আর পিতৃ-পিতামহের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধায় ও অমুরাগে হৃদয় পূর্ণ হলে তাকে কি মহনীয়ই না দেখায় !” প্রকাশ্যভাবে তিনি সুদন্তকে উদ্দেশ্য করে বললেন : “তথাগত ত’ ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরোধিতা করেন না। যিনি তাঁর ধর্মমত সম্যক্ ভাবে উপলব্ধি করেছেন তিনিই বুঝতে পারবেন যে তিনি সংস্কারক মাত্র। তিনি শুধু আমাদের কাছে ধর্মের এক উন্নততর ব্যাখ্যান প্রচার করেছেন মাত্র।”

সুদন্ত উত্তর দিল, “আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করার দ্বারা ধর্মের উচ্ছেদ সাধনই হবে।”

অনুরুদ্ধ তখন তাকে প্রশ্ন করলেন, “তুমি ‘আত্মা’ বলতে কি বোঝ ?”

সুদন্ত বেদান্ত দর্শন অনুশীলন করেছিল। সে বলল : “আমার আত্মা বলতে আমি বুঝি সেই অপরিবর্তনীয় শাস্ত্রত ‘অহম্’ (Ego) বা আমার চিন্তাশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে। ‘আমি’ বলতে তাকেই নির্দেশ করা হয়।”

অনুরুদ্ধ বলে উঠলেন, “নিঃসংশয়ে আমাদের অভ্যন্তরে এমন কিছু তত্ত্ব আছে যাকে উদ্দেশ্য করে ‘আমি’ বলা হয়ে থাকে এ যেমন আমার মধ্যে তেমনি তোমার মধ্যেও আছে। সকলের মধ্যেই আছে। কিন্তু যখন আমরা আমি ব’লে থাকি, তখন এটা একটি বাগভঙ্গী বা বিকল্প। একথা ঠিক যে ‘আমি’ শব্দটি আজীবন অপরিবর্তিত থাকে। স্বসংবেদনের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই শিশুমনে এর প্রথম উদ্ভব, তারপর এ শব্দ একে একে বালক, যুবা, প্রৌঢ় ও সবশেষে জরাগ্রস্ত বৃদ্ধকে উদ্দেশ্য করে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।”

ব্রাহ্মণ কিশোর সুদন্ত উত্তর দিলেন, “গৌতম একজন নাস্তিক—
তিনি আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। অথচ তাঁর দেশনা এতই
অসঙ্গতিপূর্ণ যে ভাবী জন্মান্তর ও শরীর গ্রহণ, এমনকি অমরত্বের
কথা প্রচার করতেও তাঁর দ্বিধা বোধ হয় না।”

শ্রমণ শান্তভাবে বললেন, “বন্ধু কথা নিয়ে মারামারি করার
কি দরকার? বরং তথাগতের ধর্মকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করার
চেষ্টা করা উচিত। তুমি যাকে অপরিবর্তনীয় বলে মনে করছ সেই
তথাকথিত অহংবুদ্ধির বিষয় যে ‘আত্মা’—তথাগতের দৃষ্টিতে তা
বিপর্যয়, ভ্রম, স্বপ্নমাত্র। তাকে আঁকড়ে থাকলে আমাদের মধ্যে
আত্মকেন্দ্রিকতার উদ্ভব হবে, যা ইহলোকে বা পরলোকে সুখের
জন্তে আমাদের লালায়িত করে তুলবে মাত্র। কিন্তু যদিও সেই
অবাস্তব ‘আত্মার’ অস্তিত্ব স্বীকার করা তোমাদের দর্শনে একটা
ভ্রম ছাড়া কিছু নয়, তবু তোমার ‘ব্যক্তিত্ব’ কিন্তু অবাস্তব নয়।
চরিত্র, চিন্তা ও কর্মের আধারস্বরূপ স্বতন্ত্র ব্যক্তিরূপ কোনও তত্ত্ব না
থাকলেও, এই সকল চরিত্রে, চিন্তা ও কর্মের সমষ্টিই সেই ব্যক্তি।
বন্ধু সুদন্ত! তোমার মধ্যে অহংবুদ্ধির গোচর পৃথক্ কোনো
‘আত্মা’ (যাকে আমার বলে নির্দেশ করা হয়ে থাকে) নেই, যে
চিন্তা করছে, বা যে তোমার চরিত্রকে নিয়ন্ত্রিত করছে। কিন্তু
তোমার চিন্তার সমষ্টিই চিন্তার কর্তা, তোমার বিশিষ্ট চরিত্রই
তোমার প্রকৃত ‘আমি’। তোমার চরিত্র, তোমার চিন্তা, তোমার
ইচ্ছা—এসবের সমষ্টিই তোমার বিশিষ্ট সত্তা, এর অতিরিক্ত কিছু
নয়। ‘তোমার’ জ্ঞান বা ‘তোমার’ চেতনা—এরকম বলা ঠিক নয়।
বরং সেই সব জ্ঞান বা চিন্তাই তুমি, একথাই যথার্থ সত্য।”

সুদন্ত প্রশ্ন করলেন, “কিন্তু আমার এই সব চিন্তা ও ভাবনার
নিয়ামক কে? এ সম্বন্ধে আপনাদের ধর্মও নীরব। যিনি উপলব্ধি
করতে পেরেছেন যে তাঁর যাবতীয় চিন্তার নিয়ামক তাঁর ‘আমি’,
বা ‘আত্মা’, তিনিই শূন্য, তাঁর জীবনই সার্থক।”

অনুরুদ্ধ তখন বললেন, “অহংবোধ তোমার শরীর বা মনের অধীশ্বর বা অধিষ্ঠাতা নয়, বা তার দ্বারা তোমার চরিত্রের বিশিষ্ট অনুভূতি বা প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে—একথাও ঠিক নয়। বস্তুতঃ তোমার যে ভাব সংস্কার সব থেকে প্রবল, তারাই তোমার সেই মনের গণ্যার্থ অধীশ্বর, তারাই তোমাকে নিয়ন্ত্রিত করছে যদি কোনো কুপ্রবৃত্তি তোমার হৃদয়ে প্রবল হয়ে ওঠে, তবে সমুদ্রবক্ষে পোত যেমন বাত্যা ও তরঙ্গের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল, তোমারও ঠিক সেই রকম অবস্থাই হবে। অপরপক্ষে যদি বোধিলাভের জগ্নে উদগ্ৰ অভিলাষ তোমার হৃদয় অধিকার করে, তবে তা তোমাকে নির্বাণরূপ পোতাশ্রয়ের অভিমুখে চালিত করে নিয়ে যাবে—পৌছলে সকল মোহ উচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, আর চিত্ত হবে শাস্ত, সরোবরবক্ষের মতই স্থির নিষ্পন্দ। কর্ম একবার অনুষ্ঠিত হলে তা আর স্থায়ী হয় না বটে, কিন্তু তোমার কর্মের দ্বারা যা অনুষ্ঠিত হবে তা থেকে যায়! যেমন যে ব্যক্তি পত্র লেখে তার লেখার এক সময় বিরতি ঘটে, কিন্তু তার লিখিত পত্র থেকে যায়। আমাদের কর্মের মধ্যেও যেটুকু স্থায়ী উপাদান আছে—তার কথা ভেবে, আমরা যদি আমাদের ভবিষ্যৎ সত্তাকে সুবিবেচনার সঙ্গে গড়ে তুলতে পারি, তবে তার চেয়ে কাম্য আর কি হতে পারে? দাক্ষিণ্য, নির্মলতা ও বিশুদ্ধচিন্তা—এই সব সম্পদ আহরণ করার দিকে মন দাও। যার চিন্তা নির্মল, কর্ম কল্যাণকর, সে-ই চিরজীবী হবে, যদিও তার দেহ বিনশ্বর। ভাবিজন্মে সে উন্নত সত্তার অধিকারী হবে এবং পরিণামে সে নির্বাণরূপ পরমা নিরুত্তি লাভ করতে সমর্থ হবে। আত্মা বলে এমন কোনো স্বতন্ত্র তত্ত্ব নেই—যার জন্মান্তর গ্রহণ সম্ভব। কিন্তু আমাদের অনুষ্ঠিত কর্মের প্রকৃতি অনুযায়ী আমাদের চিন্তা, বাসনা প্রভৃতি অবশ্যই রূপান্তর ধারণ করতে পারে।

“বুদ্ধের দেশনা হচ্ছে—সংকর্ম সাগ্রহে করা উচিত, আর যে সব

প্রবৃত্তির মূলে আছে অহঙ্কার, লালসা, জড়ত্ব বা গুরুতা—শুধু সেগুলোকেই উচ্ছেদ করতে হবে।”

কিন্তু তখনও পর্যন্ত সূদন্তের মন থেকে আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস উন্মূলিত হয়নি। বরং তার সত্যতা বিষয়ে তার ধারণা আরও দৃঢ় হয়েছিল, কেননা তার ওপরই তার ধর্মবোধ প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাই সে বলে উঠল, “আমার আত্মাকে বাদ দিলে আমার কর্মের সার্থকতা কি? বিষয়ভোগের অর্থ কি হতে পারে যদি ভোক্তা বলে কেউ না থাকে?”

শ্রমণ অনুরুদ্ধের চিন্তাক্রিষ্ট মুখমণ্ডল যেন আরও গম্ভীরভাব ধারণ করল। তিনি বললেন, “ভোগের জগৎ স্পৃহা চিত্ত থেকে সম্পূর্ণভাবে দূর কর, আত্মা সম্বন্ধে সকল চিন্তাও বিসর্জন দাও, শুধু তোমার কর্মের মধ্যেই জীবিত থাক, কেননা সেই কর্মই জীবনে একমাত্র বাস্তব তত্ত্ব। জীবমাত্রই পূর্বজন্মে অনুষ্ঠিত কর্ম অনুসারে তাদের নিজ নিজ প্রবৃত্তি লাভ করে থাকে। আমাদের বিজ্ঞানধারার প্রস্তুতিই আমাদের অধ্যাত্মজীবনের বাস্তব ভিত্তি। এক ব্যক্তি থেকে আর এক ব্যক্তিতে তা সংক্রান্ত হয়ে থাকে। ব্যক্তির মৃত্যু আছে বটে, কিন্তু তাদের বিজ্ঞানপ্রবাহ (সমুত্তি) তাদের কর্মের প্রকৃতি অনুযায়ী রূপান্তর ধারণ করে থাকে। কর্মসমষ্টিই ক্রম-বিবর্তনের ধীর মন্দের গতির অবশ্যসম্ভাবী পরিণাম হিসেবে জীবের বিজ্ঞানপ্রবাহের আকৃতিকে গড়ে তোলে, যা আমাদের ব্যক্তিত্বের মূলস্বরূপ। তুমি যাকে স্বতন্ত্র ব্যাক্তিরূপে, তোমার আত্মারূপে, কর্মফলের ভোক্তারূপে নির্দেশ করছ, তা তোমার বিজ্ঞান-সমুত্তি ছাড়া আর কিছু নয়, তা তোমার অতীত কৃতকর্মের জীবন্ত স্মৃতিমাত্র—আর কিছুই নয়। এইভাবে অতীত থেকে বর্তমানের উদ্ভব হয়েছে, আবার বর্তমানই তার গর্ভে অনাগত ভবিষ্যৎকে ধারণ করছে। এই হচ্ছে কর্মবাদ, একেই বলা হয় প্রতীত্যসমুৎপাদ বা কার্যকারণতত্ত্ব।”

কচ্চায়ন বলে উঠল, “কিন্তু এইভাবে ত আপনারা আত্মার অঞ্চ ও ঐক্য ও অভিন্নতাকে নস্যাৎ করে দিচ্ছেন।”

এর উত্তরে শ্রমণ অমুরুদ্ধ বললেন, “বরং বলা উচিত, আমি মানুষের অধ্যাত্মজীবনের বৈচিত্র্য ও ঐশ্বৰ্যের ওপরই জোর দিচ্ছি। যতক্ষণ পর্যন্ত ব্রাহ্ম অহংবোধ তোমার ওপর ভর করে রয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত নির্বাণের কোনও আশা তোমার নেই।”

শ্রমণের কথাগুলি ছিল গভীর তাৎপর্যপূর্ণ কিন্তু তৎসম্বন্ধে শ্রোতাদের মনে কোনো রেখাপাতই হল না। কচ্চায়ন মনে মনে বলতে লাগল, “গৌতমের ধর্মমত কখনও সত্য হতে পারে না। যদি শেষ পর্যন্ত তা সত্য বলে প্রমাণিত হয়ও, তবে তা হবে নিতান্তই দুঃখের কারণ। আমি সাধ্যমত আমার পিতৃপুরুষের ধর্মবিশ্বাসের অন্তর্নিহিত পরম আশাবাদকে আশ্রয় করে থাকবার জন্তে চেষ্টা করব।”

শ্রমণ মন্তব্য করলেন, “যা তোমার প্রিয়তম তাকে বেছে নিও না, বেছে নাও যা পরম সত্য, তাকে। কেননা যা পরম সত্য তাই কেবল পরম প্রিয় হতে পারে।”

কাঠোপনিষদ্

সুদন্ত বেশ সুখেই দিনাতিপাত করতে লাগল। একজন নাস্তিক তীর্থিকের ধর্মমত নিয়ে মাথা ঘামাবার মত অবসর তার ছিল না। শ্রমণ অমুরুদ্ধের সঙ্গে মতভেদের কথাকে হয়ত তার মন থেকে একেবারেই সরিয়ে দিত—কিন্তু মাঝে মাঝে যখন তার শ্বশুর মহাসুভূতি এবং শ্যালক কচ্চায়ন তথাগতের অভিনব ধর্মদেশনা নিয়ে আলোচনা করতেন তখন তার মনেও অমুরুদ্ধের সঙ্গে বিতর্কের পূর্বস্মৃতি জেগে উঠত। তাঁরা স্বীকার করতেন বটে জাতিভেদ প্রথা সমাজের নিম্নশ্রেণীর ওপর খুবই পীড়াকর ছিল—কিন্তু তৎসঙ্গেও সমগ্রভাবে সমাজের ক্ষতি না করে জাতিভেদের কাঠোর নিয়মগুলিকে শিথিল করা সম্ভব ছিল না, তাছাড়া জাতিভেদ যে ঈশ্বরানুপ্রেরিত সে বিষয়েও তাঁদের মনে কোনো সন্দেহও ছিল না। শুধু যাবতীয় ছঃখভারাক্রান্ত চेतন জীবের প্রতি সমবেদনা পরিব্যাণ্ড করে দেওয়া আমাদের প্রত্যেকেরই কর্তব্য—এবং এই সমবেদনা থেকে যাতে নিকৃষ্টতম জীবও বঞ্চিত না হয় সে দিকেই দৃষ্টি রাখা উচিত। অবশ্য দেবার্চনার প্রতি অবহেলা প্রদর্শন কিছুতেই সঙ্গত হতে পারে না—কেননা তার দ্বারা দেবতাদের রোষেরই উদ্রেক হবে। কিন্তু সত্যিই কি ঋষি-সিদ্ধ পশুবলির দ্বারা দেবতাদের কোনও প্রয়োজন সিদ্ধ হয়ে থাকে ?

এই সব প্রশ্ন স্মৃতি ও কচায়নের অন্তর চঞ্চল করে তুলত। এবং যতই তাঁরা এসব বিষয় নিয়ে অনুসন্ধান ও আলোচনা করতে লাগলেন, ততই তাঁদের হৃদয় সংশয়াকুল হয়ে উঠতে লাগল। কিন্তু তা হলেও তাঁরা ব্রাহ্মণোচিত কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হলেন না।

একদিন স্মৃতি, যিনি ছিলেন কুহরঘরের প্রধান গ্রামণী, হঠাৎ উৎফুল্লবদনে তাঁর পুত্র কচায়নের সামনে উপস্থিত হয়ে বললেন, “বৎস কচায়ন, আমার মনে হয় আমি এতদিনে সমস্তার সমাধান খুঁজে বার করতে পেরেছি। আমি যখন কঠশাখা অনুসারে নাচিকেতস অগ্নিতে আহুতি করার জন্তে প্রস্তুত হচ্ছিলাম, ঠিক সেই সময়ে এই সমাধান আমার মনে হঠাৎ উদ্ভূত হল! যজুর্বেদ অধ্যয়ন করতে করতে আমি দুর্লভ সমস্যাটির প্রকৃত রহস্য উপলব্ধি করতে পারলাম, আর সঙ্গে সঙ্গেই আমার অন্তর থেকে সব সংশয় দূর হয়ে গেল। বৎস, যাও, আমাদের বাগানে যে বড় তালগাছ আছে, তার থেকে পাতা কেটে আন, সেগুলি ভাল করে ধুয়ে নাও। তার আগাগুলি কেটে ফেলে সেগুলি লেখবার উপযোগী করে নাও। আমি তাড়াতাড়ি আমার চিন্তাগুলিকে সুস্পষ্ট রূপ দিতে চাই, বিলম্ব হলে হয়ত আমি সেগুলি বিস্মৃত হব।”

কচায়ন স্মৃতির কথা শুনে তীব্র কৌতূহলের বশে জিজ্ঞাসা করল, “আপনি কি সমাধান খুঁজে পেয়েছেন সংক্ষেপে তা আমাকে বলবেন কি?”

তখন মহাস্মৃতি বলতে লাগলেন, “শোনো বৎস, আমি তোমাকে সংক্ষেপে বলছি। মৃত্যুই সেই মহান উপদেষ্টা যিনি আমাদের জীবনের নিগূঢ়তম সমস্যাটির রহস্য উন্মোচন করতে পারেন। যিনি অমরত্বের সন্ধান পেতে চান তাঁকে মৃত্যু সদনে প্রবেশ করতেই হবে, তাঁর কাছ থেকে জীবন রহস্যের সন্ধান পেতে হবে। এ জগতে এমন কোন শিশুই ভূমিষ্ঠ হতে পারে না, যাকে মৃত্যুর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা না হয়েছে। কিন্তু মৃত্যুই (যম) ব্রহ্ম

ন বা তিনিই স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্ব প্রপঞ্চের অধিপতি বা নিয়ামক
ন। তিনি ধ্বংসের দূত হতে পারেন বটে, কিন্তু তিনি আত্মাকে



নাশ করতে পারেন না। আর যিনি মৃত্যুভয়ে ভীত নন, তিনি
কিটি বর লাভ করে থাকেন। যারা তাঁর গৃহে প্রবেশ করে

থাকে মৃত্যু তাদের সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করতে ও পুনর্ব্যবস্থা জন্মগ্রহণ করতে অনুমতি দেন। তাঁরই নির্দেশে মনুষ্যের যাবতীয় কর্ম অবিনাশী হয়ে বিরাজ করে। আর যারা নির্ভীক জিজ্ঞাসু মৃত্যু তাদের দৃষ্টির সামনে জীবনের রহস্যজাল উদ্ঘাটিত করে থাকেন।”

কচ্চায়ন সোৎসাহে বলে উঠল, “পিতঃ, আপনার এইসব চিন্তা সত্যই অতি গম্ভীর। কিন্তু আমার প্রধান জিজ্ঞাসু হচ্ছে, মৃত্যুর কাছ থেকে আমরা কি শিক্ষা পেয়ে থাকি?”

সুভূতি কিছুক্ষণ ধরে তাঁর চিন্তাগুলিকে যেন গুছিয়ে নিয়ে বলতে লাগলেন, “তথাগতের দেশনা আমার মনকে অত্যন্ত বিচলিত করেছে সন্দেহ নেই—কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমি নিঃসন্দেহ হতে পারিনি যে আমাদের পৈতৃক পবিত্র ধর্মের মূল সিদ্ধান্তগুলি ভিত্তিহীন। অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ কি সত্যই নিষ্ফল অনুষ্ঠানমাত্র? যদি সত্যই তাই হত, তবে আমাদের ঋষিরা শুধু অন্ধ জনসাধারণেরই শিক্ষক নন, তাঁরা নিজেরাও অন্ধ—শাক্যমুনি যেমন বলে থাকেন যে নিজের অন্তরের বাসনা জয় করতে পারে নি, ক্ষণস্থায়ী বিষয়ের সঙ্গে তার আসক্তির বন্ধন যে ছেঁদন করতে সমর্থ হয় নি—যাগযজ্ঞ শুধু তার কাছেই নিষ্ফল।”

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর সুভূতি আবার বলতে আরম্ভ করলেন: “স্থায়ী অপরিণামী আত্মা সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাসও সম্পূর্ণ অলৌকিক হতে পারে না। আমি এখন উপলব্ধি করতে পেরেছি যে আত্মার উৎপত্তি নেই। এই আত্মাই সকল পদার্থের একমাত্র অন্তর্ধামী—বাক্য ও মনের অগোচর। আত্মা শুধু হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে। ‘ওম্’ এই অক্ষরের দ্বারা আত্মাকে নির্দেশ করতে পারা যায়। আত্মা সেই অব্যয় তত্ত্ব যা জন্ম ও মৃত্যুর অতীত।”

কচ্চায়ন সুভূতির কথা শুনে বলে উঠলেন, “তাহলে আপনার

সমাধান কি নতুন এক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম—যা পুরাতন ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে সমর্থন করবে ?”

সুভূতি উত্তর দিলেন, “হ্যাঁ ঠিক তাই। কিন্তু আমাদের বন্ধু শ্রমণ অনুরুদ্ধের ব্যাখ্যান আমার দৃষ্টিভঙ্গীকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছে। আমি এটা স্বীকার করি, শ্রেয়ঃ এক জিনিষ আর প্রেয় আর এক জিনিষ। আর কল্যাণের জন্য শ্রেয়ঃকে বিসর্জন দিয়ে প্রেয়কে বরণ করাই যে উচিত এও আমি জানি। তথাগত তাঁর শিষ্যদের যে উপদেশ দিয়ে থাকেন যে সংহত পদার্থ মাত্রই বিনশ্বর—এর সত্যতা আমি অস্বীকার করতে পারি না কিন্তু আমার অন্তরের গভীর অন্তঃস্থলে আমি ঠপলকি করি এমন কিছু অবশ্যই আছে মৃত্যু যাকে ধ্বংস করতে পারে না। আর সেই অবিনশ্বর ভবকেই আমাদের ঋষিরা বলে থাকেন ‘আত্মা’। আমি সেই আত্মার স্বরূপ জানবার জন্যে উদ্গ্রীব হয়েছি—কেন না, সে আত্মাকে জানলেই চিন্তের প্রশান্তি লাভ করা সম্ভব। অনুরুদ্ধ আমাকে সেই আত্মার রহস্য ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন। কিন্তু তিনি যদি বলেন যে এমন কিছুই নেই যাকে আমার সম্পূর্ণ নিজের বলে দাবী করতে পারি, যদি তিনি বলেন, এই জগৎ শূন্য স্বভাব, এখানে শাস্ত বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব কল্পনাই করা যায় না—তবে তাঁর সে কথা মেনে নিতে পারব না।”

*

*

*

ক্রমে বর্ষা উপস্থিত হল। সে সময় দেখা যেত মহাসুভূতি তাঁর অলিন্দে বসে কি যেন লিখছেন। শেষে যখন মেঘের আবরণ সরিয়ে দিয়ে উজ্জল নীল আকাশে সূর্যদেব তাঁর পূর্বের দীপ্তি নিয়ে পুনর্বার আবির্ভূত হলেন, তখন মহাসুভূতির গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত হয়ে গেছে। তিনি সেই গ্রন্থের নাম রাখলেন—“কঠোপনিষদ্।”



কর্মের অমরত্ব

এই রকম সময়ে, যখন আবহাওয়া অল্পকূল থাকত, ভগবান বুদ্ধের শিষ্যমণ্ডলী তাঁদের নিজের নিজের ইচ্ছামত তীর্থদর্শনে বের হতেন, নানা জনপদের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে তাঁরা তথাগতের মাহাত্ম্যপূর্ণ মুক্তির বাণী জনসমাজে প্রচার করতেন। শ্রমণ অমুরুদ্ধও সেইমত আবার অবস্থা গ্রামের মধ্য দিয়ে পদব্রজে ভ্রমণ করছিলেন, এমন সময় দেখতে পেলেন স্মৃতি তাঁর বাসগৃহের সম্মুখে এক শালবৃক্ষের ছায়ায় বসে তাঁর রচিত গ্রন্থ মনোযোগ দিয়ে পড়ে যাচ্ছেন। হৃৎকনের দেধা হতে তাঁরা পরস্পরকে অভিবাদন করলেন। অমুরুদ্ধ যখন গ্রন্থের পাতুলিপিটি দেখলেন, তখন তাঁরা গভীর আগ্রহে পরলোকের সমস্তা নিয়ে আলোচনায় মগ্ন হলেন।

স্মৃতি অমুরুদ্ধকে তাঁর রচিত ‘কঠোপনিষদ্’ পড়ে শোনাতে লাগলেন। শ্রমণ সেই গ্রন্থের রচনার সৌন্দর্য ও ভাবের গভীরতায় সাতিশয় প্রীত হলেন। কিন্তু তিনি মাথা নেড়ে বলে উঠলেন, “একথা সত্য যে শাস্ত্রত বলে কিছু তত্ত্ব আছে—কিন্তু সেই শাস্ত্রত তত্ত্ব ‘আত্মা’ নয়, তা কোন জীবও নয়, বা পৃথক্ কোনো সত্তাও নয়, আমাদের চিন্তবৃত্তির সংবেদনের অবস্থায় যে অহংবোধের উদ্ভেক হয়, সেই ‘অহম্’ও কোনো শাস্ত্রত তত্ত্ব নয়। যাবতীয় পদার্থ, যাবতীয় প্রাণী, যাবতীয় সত্তা, বা রূপ সকল সংহত পদার্থমাত্রেরই

লয় অবশ্যস্তাবী। আপনারা যখন মনে করে থাকেন—শাশ্বত তত্ত্ব হচ্ছে এমন কিছু যা অণু হতে অণুতর, মহৎ থেকে মহত্তর,—তা ঠিক নয়। তা অণুও নয় মহৎও নয়। এর কোনও আকারই নেই, বস্তু-সত্তাও নেই। অমর বা শাশ্বত বলতে আমরা সেই সব ধ্রুব সত্যকে বুঝি, যার দ্বারা এই অস্তিত্ব নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এ হচ্ছে সেই অপরিবর্তনীয় নীতি, যার উপলব্ধিতেই আমাদের বোধি সম্ভব হয়ে থাকে। সেই সর্বোচ্চ তত্ত্ব হল চতুর্বিধ আর্ষসত্য—(তৃপ্ত, সমুদয়, নিরোধ, আর্ষ অষ্টাঙ্গিক মার্গ) যা আমাদের তৃপ্ত থেকে নিষ্কৃতি লাভের উপায় নির্দেশ করতে পারে।”

সুভূতি বললেন, “আমি স্বীকার করি যে শাশ্বত তত্ত্ব কোনো জড়বস্তু হতে পারে না। বা তা কোনও ‘সংঘাত’-রূপও হতে পারে না। অবশ্যই তা হবে অজড় স্বভাব এবং আধ্যাত্মিক। শরীর আত্মা নয়, ইন্দ্রিয় বা মন বা বুদ্ধি—এদের কোনটিই ‘আত্মা’ নয়। যার সাহায্যে জীব যাবতীয় পদার্থ প্রত্যক্ষ করে থাকে, তা সে জাগ্রদবস্থাতেই হোক বা স্বপ্নাবস্থাতেই হোক, তাকেই ‘আত্মা’ বলা যেতে পারে। ‘অহমস্মি’ (‘আমি আছি’) এই যে বোধ, এই হচ্ছে সর্বব্যাপী আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ, যা শরীরের মধ্যে বাস করেও অশরীরী, যেমন অরণিদ্বয়ের মধ্যে অলক্ষ্যভাবে বিরাজ করে অগ্নি।”

শ্রমণ অমুরুদ্ধ গভীর মনোযোগ সহকারে সুভূতির কথাগুলি শুনতে লাগলেন। তারপর হঠাৎ বলে উঠলেন, “অরণিদ্বয়ের মধ্যে অগ্নি প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে একথা ভুল। অরণিদ্বয়ও কাঠখণ্ড ছাড়া কিছু নয়। তাদের কোনোটির মধ্যেই কি আগুনের কোনো অস্তিত্ব আছে? আগুন জ্বলে ওঠে তখনই যখন আপনি তৃহাত দিয়ে সে ছটিকে ঘর্ষণ করেন। ঠিক সেই রকমেই যখন নিমিত্ত-গুলির সমন্বয় ঘটে, তখনই আমাদের চৈতন্যের উদ্রেক হয়, আর সেই নিমিত্তের তিরোভাব ঘটলেই চৈতন্যেরও আর কোনো চিহ্ন থাকে না। যখন কাঠখণ্ড ভস্মীভূত হয়ে যায়, তখন আগুন কোথায়

যায়? নিমিত্ত সমুদায় তিরোভূত হলে চৈতন্যই বা কোথায় আশ্রিত হয়ে থাকে?” শূভ্রতি উত্তর দিলেন, “হে বন্ধু, শোনো, পদার্থ এবং তার ক্রিয়া বা ধর্ম এ দুটিকে এক বলে মনে করা ভুল আগুন এবং তার শিখা এক নয়, সেই রকম চৈতন্য ও তার প্রকাশের মধ্যে ভেদ আছে। যেমন ভেদ আছে কোনো পুরুষের সঙ্গে তার বিভিন্ন গুণের, তার চিন্তবৃত্তির ও প্রযত্নের; বায়ু ও তার দ্বারা সঞ্চারিত স্পন্দন যেমন পরস্পর ভিন্ন।”

ব্রাহ্মণ শূভ্রতির অতিথি শ্রমণ অনুরুদ্ধ যেন চিন্তা করতে করতে বলতে লাগলেন :

“সত্যিই কি তাই? হ্যাঁ, আমরা বলে থাকি বটে, ‘বাতাস বইছে’ যাতে মনে হতে পারে ‘বাতাস’ বলে কিছু আছে যার ক্রিয়া হচ্ছে ‘বয়ে যাওয়া’। কিন্তু বস্তুতঃ দুটি বিভিন্ন পদার্থ নেই—প্রথমে ‘বাতাস’, তারপর তার ক্রিয়া ‘বয়ে যাওয়া’—এই দুয়ের কোনো ভেদ নেই। সত্যি বলতে গেলে একটি পদার্থই আছে,—বা হচ্ছে বায়ুর ‘বেগ’, যাকে আমরা ‘বাতাস’ বলি; কিংবা আমাদের শব্দ প্রয়োগকে যদি কিছুটা শিথিল করি তবে হয়ত বলা যেতে পারে ‘বাতাসের বেগ’। ঠিক একই ভাবে বলা চলে, এমন কোনো সত্ত্ব ব্যক্তি নেই যে তার কৃতকর্ম স্মরণ করে থাকে; বস্তুতঃ কৃতকর্মের স্মৃতিগুলিই সেই ‘ব্যক্তি’—ব্যক্তির সত্তা তার থেকে অতিরিক্ত কিছু নয়।”

শূভ্রতি বললেন, “কোনো লোক যখন মারা যায়, তখন কেউ বলে ‘সে আছে’, আবার কেউ বা বলে ‘সে নেই’। আমি যতদূর জানি তথাগতের মতে তার আর অস্তিত্ব থাকে না—যার অর্থ সোজাসুজিভাবে বলতে গেলে এই দাঁড়ায়, পরলোক বলে কিছুই নেই।”

অনুরুদ্ধ তৎক্ষণাৎ সজোরে বলে উঠলেন, “না, তা নয়। তা নয়। আপনার এই সমস্তার মূলে আছে একটি ভ্রান্ত প্রতিজ্ঞা। আপনি

যাকে ‘আত্মা’ বলেন, বর্তমানেই যখন তার কোনো অস্তিত্ব নেই, তখন আপনার মৃত্যুর পর তার অস্তিত্ব কিভাবে সম্ভব হতে পারে ? কিন্তু, আপনার যা বর্তমান সত্তা, তা’ আপনার দেহত্যাগের পরও থেকে যাবে ‘কঠোপনিষদে’ যে পুরুষকে প্রাচীন অশ্বথ বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, যার মূল উর্ধ্বদিকে প্রসারিত আর শাখাসমূহ নিম্নগামী—তা যথার্থই। বৃক্ষ যেমন তার যাবতীয় বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখে বার বার আবির্ভূত হয়ে থাকে, ঠিক সেই ভাবে পুরুষও নব নব শরীর ধারণ করে থাকে, আর তার স্বকীয় কর্মপ্রবাহও নব নব জীবের মধ্যে নব জন্মগ্রহণ করে থাকে। উচ্ছ্বস বৃক্ষের মধ্যে কোনও আত্মা বলে পদার্থ নেই যা মূল বৃক্ষ থেকে নব নব অঙ্কুরের মধ্যে সংক্রামিত হয়ে থাকে ; কিন্তু বৃক্ষের যত কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সেই সবই উত্তরকালীন বিবর্তনের মধ্যেও অবিকল রক্ষিত হয়—জীবের ক্ষেত্রেও সেই একই নিয়ম খাটে”।^১

সুভূতি তখন উত্তর দিলেন, “একজনই মাত্র শাস্ত্রত ‘বিজ্ঞাতা’ আছেন, যিনি অনিত্য যাবতীয় জ্ঞানের সংবেদক বা জ্ঞাতা। সেই শাস্ত্রত ‘বিজ্ঞাতা’ই আমার মতে ‘আত্মা’।”

অমুরুদ্ধ সুভূতিকে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, “আপনি যা বলছেন, তার বিপরীতটিই সত্য নয় কি ? ‘যারা চিন্তা করে তারা অস্থায়ী, কিন্তু যে সব বিষয়ে তারা চিন্তা করে সেগুলি শাস্ত্রত’—এই কি যথার্থ নয় ? অত্যাধিক বলতে গেলে বলতে হয়—আমরা যাকে বিজ্ঞাতা বলে মনে করছি, তা শুধু আমাদের আস্তর ভাবনারই সংবেদন মাত্র, আর যথার্থ ভাবনা সম্বন্ধে যে উপলব্ধি তাকেই শাস্ত্রতপদ প্রাপ্তি বলা যেতে পারে। সত্যই কেবল শাস্ত্রততত্ত্ব, সত্যই যথার্থ নির্বাণ”।

আলোচনার গতি যেন হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ

পরে বৌদ্ধ শ্রমণ আবার বলতে আরম্ভ করলেন, “আপনার কঠোপনিষদ সমস্যাটি নিয়ে শুধু আলোচনাই করেছে। ইহ-জীবনের পর পরলোক কিভাবে সম্ভব হতে পারে, তারই একটা রূপ দাঁড় করানর চেষ্টা এতে করা হয়েছে; কিন্তু সমস্যার কোনো সুনির্দিষ্ট সমাধান নির্দেশ না করে, এতে যেন শূন্যে এক মনোরম সৌধ নির্মাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। সমস্যার প্রকৃত সমাধান কেবল তথাগতের দেশনার মধ্যেই পাওয়া যেতে পারে।”

ব্রাহ্মণ মহাসুভূতির মনে হতে লাগল যেন তাঁর অতি পবিত্র বিশ্বাসগুলির স্থান এর মধ্যে নেই। তাই প্রশ্ন করতে গিয়ে যেন তাঁর কণ্ঠস্বর ঈষৎ কম্পিত হল, “তা হলে আমার মধ্যে এমন কিছু নেই যা অব্যয়, যা শাস্ত্রত ও মৃত্যুহীন?”

অনুরুদ্ধ উত্তর দিলেন, “আপনার মধ্যে অমর শাস্ত্রত কিছু তত্ত্ব আছে কি না, তা নির্ভর করে শুধু আপনারই ওপর। যদি আপনার চিন্তা ও ভাবনা বিশুদ্ধ ও পবিত্র হয়, তা হলে আপনিও বিশুদ্ধ ও পবিত্র। যদি আপনার চিন্তা হয় পাপ-কলুষিত, তবে আপনি নিজেও পাপী। আর যদি অন্তঃকরণ শাস্ত্রত ভাবনায় পূর্ণ হয়ে ওঠে, তবে আপনি নিজেও হয়ে উঠেন মৃত্যুহীন, অব্যয়। সত্যের উপলব্ধিই যথার্থ অমরত্ব, আর সত্যের সাধনাই নির্বাণ।”

সুভূতি শ্রমণের কথায় মাথা নেড়ে বললেন, “আমি সত্য উপলব্ধি করতে চাই, কিন্তু আমি চাই না যে আমার ব্যক্তিত্বরূপ বিলুপ্ত হোক।”

শ্রমণ অনুরুদ্ধ মন্তব্য করলেন, “কিন্তু আমি চাই সত্য যেন আমাকে এমনভাবে অধিকার করে যাতে সত্যের জ্ঞান আমি আমার ব্যক্তিসত্তাকে সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে ফেলতে পারি! নিজের আত্মার থেকেও উন্নততর কোনো লক্ষ্য জীবনে থাকা এটা কত বড়ই না আশীর্বাদ!”

স্মৃতি বিষয় বিস্মারিত দৃষ্টিতে তাঁর বন্ধুর দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপরে বললেন, “আমার মৃত্যুর পর যখন আমার দেহ বিলীন হ’য়ে যাবে, তখন আমি কি হব? আত্মাকে হারাবার কথা মনে হ’লেই আমি শঙ্কিত হ’য়ে উঠি। তখন কি এমন কিছুই থাকবে না যাকে আমি আমার নিজস্ব বলতে পারি?”

অনুরুদ্ধ বললেন, “এ বিষয়ে ভগবান তথাগতের বাণীই আমার উত্তর তিনি বলেছেন :

“ইহজীবন ত্যাগ করার সময় আমাদের কিছুই অনুসরণ করে না।

সব কিছুই আমাদের ফেলে যেতে হবে।

স্ত্রী, কন্যা, পুত্র, জাতি, বন্ধু,

হিরণ্য, শস্ত্র, ধন-সম্পদ—সব কিছুই।

কিন্তু আমাদের কর্ম

যা আমরা কায়মনোবাক্যে সম্পাদন করে থাকি—

কেবল সেগুলিকেই আমাদের নিজের বলে মনে করতে পারি।

এগুলিকে আমরা পিছনে ফেলে রেখে যেতে পারি না ॥

কর্ম ছাড়ার মত কর্তাকে অনুসরণ করে,

কখনও সরে যায় না।

পাপকর্ম কখনও গোপন করা যায় না,

সৎকর্মও কখনও হারিয়ে যায় না,

যথা সময়ে তারা পূর্ণ মহিমায় প্রকাশিত হবেই।

এস. আমরা সবাই, সৎকর্মে রত হই—

জীবনের উর্বর ক্ষেত্রে গুলোই হবে বীজস্বরূপ ;

আমাদের অন্তরের মধ্যে ইহজীবনে যে পুণ্য সঞ্চয় করি

পরবর্তী জীবনে তারাই বহন করে আমাদের অশেষ আশীর্বাদ ॥”^১

১। দ্রষ্টব্য : সংযুক্তনিকায়। Warren, Buddhism in Translation, p. 228.

তথাগতের এই বাণী আবৃত্তি করতে করতে অনুরুদ্ধ বলে চললেন, “আপনার কর্মই আপনার স্বকীয় বস্তু এবং চিরকাল তা আপনার নিজস্ব হয়েই থাকবে। মনে করবেন না আপনার চিন্তা, আপনার বাক্য, আপনার অনুষ্ঠিত কর্ম তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়ে যায়। এগুলি আপনার সঙ্গে সঙ্গেই থেকে যাবে। এগুলিই যে সেই জীবন্ত উপাদান যা দিয়ে তৈরী হচ্ছে আপনার ব্যক্তিসত্তা। স্বর্গে, মর্ত্যে বা নরকে এমন কোনো শক্তিই নেই যার সাহায্যে আপনি এদের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেন। আপনার জীবনের অবিচ্ছিন্ন ইতিহাসই হচ্ছে আপনার ‘আত্মা’, আপনার যথার্থ ‘আত্মা’ বা নিজস্ব সত্তা; আর মৃত্যুর পরও যখন আপনার সেই জীবনেতিহাসের ধারাবাহিকতায় কোনো ছেদ পড়ে না, তখন আপনার ব্যক্তি সত্তার অভিন্নতাও অক্ষুণ্ণই থাকে। আমরা ইহলোক থেকে যখন প্রস্থান করব, তখন আমাদের নিজ নিজ কর্মানুসারে আমাদের জীবনের গতিও অবিচ্ছিন্ন থাকবে।”

মহামারী

কালক্রমে সুদন্তের সংসারে একে একে তিনটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হল। তিনটিই পুত্র সন্তান এবং তাদের প্রত্যেকের মধ্যেই ছিল ভাবী সৌভাগ্যের প্রচুর সম্ভাবনা। সুদন্তের বৈষয়িক সাফল্য তার প্রত্যাশাকেও ছাড়িয়ে গেল। কিন্তু সময় এক রকম যায় না—আমরা যখন বিপদের জন্তে একেবারেই প্রস্তুত থাকি না, হয়ত ঠিক তখন চারদিকে বিপদ এসে আমাদের ঘিরে ফেলে। হঠাৎ দীর্ঘ অনাবৃষ্টির ফলে সে অঞ্চলের যত কৃপ ও জলাশয় ছিল সব গেল শুকিয়ে—ফলে সর্বত্র দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব ঘটল, সঙ্গে সঙ্গেই দেখা দিল ব্যাপক আকারে সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ। জনপদের অধিবাসীরা মিলিত হয়ে দেবদেবীর উদ্দেশে কাতরভাবে প্রার্থনা করতে লাগল। উপবাস করে তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে লাগল। পুরোহিতেরা দেবতাদের উদ্দেশে যজ্ঞে পশুবলি দিতে লাগলেন, মন্ত্রপাঠ করতে লাগলেন—কিন্তু কিছুতেই বৃষ্টির দেখা মিলল না। আরও পশুবলি দেওয়া হল—নিহত পশুর রক্তের ডাক স্বর্গ পর্যন্ত পৌছল। তবুও অনাবৃষ্টির অবসান হল না। পুরোহিতদের কাতর প্রার্থনা ও মন্তোচ্চারণ দেবতাদের কানে প্রবেশই করল না। দুর্ভিক্ষ আরও ভয়ানক আকার ধারণ করল, রোগের আক্রমণ ক্রমশঃ বেড়েই চলল।

গ্রামের প্রধান মহামুহূর্তি তাঁর সাধ্যমত দুর্ভিক্ষপীড়িত অধি-

বাসীদের দুঃখ কষ্টের লাঘব করবার জন্তে চেষ্টা করতে লাগলেন। তাঁর প্রচুর বিত্ত ছিল—কিন্তু দরিদ্র অধিবাসীদের উদর ভরণের পক্ষে তা পর্যাপ্ত ছিলনা।

সুদন্ত পীড়িতদের সেবার জন্তে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগল।



তার পিতা ছিলেন পুরোহিত—ফলাদির জন্ত নানাবিধ ওষধি তাঁকে সংগ্রহ করতে হত—তাই সুদন্তেরও তাঁর কাছ থেকে বিভিন্ন ওষধির উপকারিতা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করবার সুযোগ হয়েছিল। সুদন্ত নানাবিধ ওষধির রস থেকে রোগীদের চিকিৎসার জন্তে ওষুধ তৈরী করত—একাজে তাকে যথেষ্ট সাহায্য করতেন তাঁর স্বশুর উদারচেতা মহামুভূতি আর তার শ্যালক কচ্চায়ন।

যখন মহামারীর শেষ পর্যায়ও স্তিমিত হয়ে এল, তখন গ্রামগী মুভূতি নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। প্রথম মনে হয়েছিল হয়ত তাঁর এ অসুস্থতা দীর্ঘকাল রাত্রি জাগরণ জনিত ক্লান্তি ও শোক দুঃখ থেকেই হয়েছে। কিন্তু শীঘ্রই এটা স্পষ্ট হয়ে উঠল যে মহামারী তাঁকেও স্পর্শ করেছে। তাঁর অবস্থা ক্রমশঃই খারাপের দিকে

এগোতে লাগল। অবশেষে তাঁর আত্মীয় পরিজনবর্গ তাঁর রোগ-শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হল—কিছুতেই যেন সাস্থ্য দেওয়া যাচ্ছিল না।

সুভূতি সকলের প্রতিই এত সদয় ছিলেন যে তারা যেন ভেবেই পাচ্ছিল না কিভাবে তাঁকে হারিয়ে তাদের বেঁচে থাকা সম্ভব হবে। কিন্তু সুভূতি নিজে স্থির, অবিচলিত রইলেন। তিনি তাঁর পুত্র, কন্যা পৌত্র সকলকে সাস্থ্য দিলেন। বললেন, “ছুঃখ করে কি হবে? আমাদের এই রক্তমাংসের শরীর নষ্ট হলে ক্ষতি কি? জীর্ণ বস্ত্রের মতো ত একদিন আমাদের এই জরাগ্রস্ত রোগজীর্ণ দেহ নষ্ট হবেই। যদি শুধু তোমরা বিশ্বস্তভাবে আমার আদর্শ অনুসরণ করতে পার, তবে মৃত্যুও আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে পারবে না।”

ক্রমে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল—সুভূতি তখন তাঁর কন্যা ও পৌত্র-দৌহিত্রদের তাঁর পাশ থেকে সরিয়ে দিলেন। শুধু পুত্র কচায়ন ও জামাতা সুদত্তকে তাঁর কাছে থাকতে বললেন। কিছুক্ষণের জ্ঞা যখন রোগযন্ত্রণার কিছুটা উপশম হল, সুভূতি বলতে লাগলেন, “যে সব অবর্ণনীয় ছুঃখ কষ্ট আমি নিজের চোখে দেখলাম, তাতে আমার দৃষ্টি উন্মীলিত হয়েছে—আমি তথাগতদের উপদিষ্ট আর্য্যসত্যের মর্ম উপলব্ধি করতে পেরেছি। আমার পুনর্জন্ম যেখানেই হোক না কেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে কোনো উন্নততর জীবনে আমার উত্তরণ ঘটবে, আর আমি অন্ততঃ আর এক পা নির্বাণরূপ পুণ্য লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারব।”

সুদত্ত বলে উঠল, “পিতঃ, আপনি যা বলছেন তাতে কোনো সন্দেহই নেই। আপনি আপনার দীর্ঘ জীবন পরের হিতের জ্ঞা উৎসর্গ করেছেন—তার পুরস্কার অবশ্যই আপনার প্রাপ্য। ব্রহ্ম-লোকের অপার নিবৃত্তিই সেই অমূল্য পুরস্কার।”

আর একবারের জ্ঞে তাঁর সব শক্তি সঞ্চয় করে সুভূতি উত্তর দিলেন, “এখনও অনেক কর্তব্য অবশিষ্ট আছে—এখন পুরস্কারের

কথা বলো না। যারা আত্মচিন্তা আশ্রয় করে থাকেন ব্রহ্মলোক তাঁদেরই জন্তে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে আমার বর্তমান শরীর পরিগ্রহ এখানেই উপশান্ত হবে। কিন্তু মানবজাতির প্রতি আমার প্রেম, দুঃখার্থীদের প্রতি আমার সহানুভূতি, আমার সত্যানুসন্ধানের জন্তে ব্যাকুল আগ্রহ—এ সব বিনষ্ট হবে না। যতদিন পর্যন্ত এ সংসার থেকে দুঃখের চিহ্নমাত্র অবলুপ্ত না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত সুখের স্বর্গলোকে প্রবেশ করবার জন্তে বিন্দুমাত্র অভিলাষও আমার মনের মধ্যে স্থান পাবে না—আমি বরং নরকের গভীরতম অন্ধকার লোকে বার বার জন্মগ্রহণ করবার জন্ত উদ্গ্রীব হয়ে থাকব। কেননা সেখানেই দুঃখের মাত্রা সবচেয়ে বেশী সেখানেই মুক্তির সর্বাধিক প্রয়োজন। যারা মোহাচ্ছন্ন তাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করবার, যা বিনষ্ট তাকে পুনরুদ্ধার করবার, যারা বিপথগামী তাদের সত্য পথে পরিচালিত করবার যোগ্যস্থান সেখানেই।”

এই কথাগুলি বলবার সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতি ক্লান্ত হয়ে বিছানায় এলিয়ে পড়লেন। তিনি অব্যক্ত জড়িত কণ্ঠে বৌদ্ধদের ত্রিশরণ মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলেন :

“বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি

ধর্মং শরণং গচ্ছামি

সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি ॥”

এভাবে তাঁর অন্তরের গভীর বিশ্বাস প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর চোখ দুটি স্তিমিত হয়ে এল—কিছুক্ষণ আগেই যে চোখ দুটি পবিত্র উদ্দোপনায় জ্বল জ্বল করছিল। তিনি শাস্তিতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন।

ঘরটির চারদিকে একটি পবিত্র স্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল

ঘটনাক্রমে ঠিক সেই দিনই সন্ধ্যায় অমণ অনিরুদ্ধও কুছরঘর গ্রামের মধ্য দিয়ে পদযাত্রায় বেরিয়েছিলেন। যখন তিনি সুভূতির বাসগৃহে এসে উপস্থিত হলেন তিনি জানতে পারলেন যে তাঁর বন্ধু



আর জীবলোকে নেই। তিনি কচায়ন ও সুদন্তকে অভিবাদন করে তাদের সঙ্গে নিঃশব্দে উপবেশন করলেন।

সূর্যদেব অস্ত গেছেন—কচায়ন একটি প্রদীপ জ্বালালেন।
সকলেই নির্বাকভাবে রইলেন।

ক্রমশঃ রাত্রি উপস্থিত হল। অমুরুদ্ধের শাস্ত গভীর কণ্ঠে
ধ্বনিত হয়ে উঠল :

“সাংসারিক পদার্থ কতই ভঙ্গুর !

মানব জীবন কত অস্থির !

কিন্তু মৃত্যুলোকের প্রবেশদ্বারেই শাস্তি বিরাজ করছে—

যেখানে সকল দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের অবসান।

“এই জীবনের প্রতি মুহূর্তেই বিচ্ছেদ—

আর একজন সেই শ্রোত অতিক্রম করলেন।

তোমরা বারা, যন্ত্রণায় কাতর হয়ে প্রতীক্ষা করছ,

তোমরা শুধু তার কথাই ভাব যার কখনো বিনাশ নেই।

“সব নদীই প্রবাহিত হতে হতে

শেষে স্দূর সমুদ্রে গিয়ে মিশবে।

আমরা যে বীজ বপন করে চলেছি

কালক্রমে তা শস্তে পরিণতি লাভ করবেই ॥”^১

পুঁথির প্রতিলিপি

রাজগৃহে যাবার পথে কচ্চায়ন শ্রমণ অমুরুদ্ধের সঙ্গে যোগ দিল। সেখানে যখন সে তথাগতের দর্শন লাভ করল, যখন তাঁর মুখ থেকে তার নিজের ধর্মমতের ব্যাখ্যান শুনতে পেল, তখন সে শ্রমণসঙ্ঘে প্রবেশ করল। শীঘ্রই সে তার প্রস্তার জ্ঞেয়ো সঙ্ঘের সভ্যদের মধ্যে প্রসিদ্ধি অর্জন করল। যখন সে নিজের গৃহে ফিরে এল, তখন কুহুরঘরের সন্নিকটেই ‘গিরিকূট’ নামক অঞ্চলে সে নির্জন-বাস করতে লাগল। গ্রামের অধিবাসীরা তাকে ডাকত ‘মহা-কচ্চায়ন’ বলে। কেননা তারা ব্রাহ্মণ হলেও যদিও তাকে নাস্তিক বলেই মনে করত, তবু তার প্রতি তাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। তারা বলতে লাগল, “মহাকচ্চায়ন তথাগতের প্রধান শিষ্যদের মধ্যে একজন—ইনি ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ উভয় শাস্ত্রেই পারঙ্গম। ইনি যে নিজের সাধনার বলে পাণ্ডিত্য ও পবিত্রতার সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছেন—এ আমরা ভালভাবেই জানি।”

সুদন্ত তাঁর পূর্বপুরুষদের ধর্মমতে আস্থা হারিয়েছিলেন, যদিও প্রকাশ্যভাবে বৌদ্ধধর্ম তিনি গ্রহণ করেন নি। একদিন সুদন্ত তাঁর শ্যালক কচ্চায়নের সঙ্গে গ্রামের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে বললেন, “পিতা বা কোনো স্বজন—যাঁদের আমরা গভীরভাবে ভালবাসি, তাঁদের হারান কতই না বেদনাদায়ক! সত্যি বলতে কি, এমন

কোন ধর্মমতই বোধ হয় নেই, যা আমাদের দুঃখ শোক ভুলিয়ে দিয়ে ষথার্থ শাস্তি এনে দিতে পারে !”

কচ্চায়ন উত্তর দিলেন, “ভাই, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার নিজের ব্যক্তিগত দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়াই তোমার লক্ষ্য হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি মুক্ত হতে পারবে না। তোমার শোক ও দুঃখের বেদনা যতই গভীর হোক না কেন, তাকে আপন পথে এগোতে দাও; জগতের সব প্রাণী যার অধীন, প্রকৃতির সেই অমোঘ নিয়মের থেকে মুক্তি লাভ করবার চেষ্টা করো না।”

সুদত্ত তার প্রতিবাদ করে বলে উঠল, “কিন্তু তুমি একবার যারা মৃত তাদের অবস্থা ভেবে দেখ। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাদের সমস্ত অস্তিত্ব একেবারে মুছে যাবে—যেন তারা কোনো কালেই বর্তমান ছিল না,—একথা চিন্তা করতেও কি ভয় হয় না ?”

কচ্চায়ন উত্তর দিলেন, “এইখানেই তোমার ভ্রম। মৃত্যু এক রকম বিশ্লেষ, কিন্তু তার ফলে কোনো জীবের অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হয়ে যায়, যেন সে কখনও ছিলই না—এ কথা ঠিক নয়। কেন না তার অমুষ্ঠিত প্রতিটি কর্মই তার নিজের বৈশিষ্ট্য দিয়ে অবিচ্ছিন্ন ধারায় বইতে থাকে।”

সুদত্ত তার শ্যালককে বাধা দিয়ে বলে উঠল—তার মুখমণ্ডলে ক্রীণ বিষণ্ণ হাসি ফুটে উঠল, “এত শুধুই কথার কথা। যদি মৃত জীবেরও জীবন প্রবাহ অবিচ্ছিন্নই থাকে, তবে আমাকে বলে দাও আমার পিতৃদেব এখন কোথায় ?”

কচ্চায়ন উত্তর দিলেন, “তিনি কি আমাদের সঙ্গেই নেই ?” তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলতে লাগলেন, “গ্রন্থের ক্ষেত্রে যেমন মানুষের ক্ষেত্রেও সেই একই রকম দেখা যায়। তুমি তোমার ইচ্ছামত ভাল পাতার ওপর তোমার নিকৃষ্ট চিন্তা বা উন্নত চিন্তা সমূহকে লিখে রাখতে পার। গ্রন্থ বলতে কতকগুলি পাতার সমষ্টিকে বোঝায়। পাতাগুলি শুধুই লেখকের লেখসামগ্রী ছাড়া

কিছু নয়—তালগাছে এরকম হাজার হাজার পাতা রয়েছে, যেগুলি কোনো কালেই গ্রন্থাকারে পরিণত হবে না। ~ আমাদের পিতৃদেব মহামান্য স্মৃতি যখন মৃত্যুর রহস্য নিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলেন, সেই অবস্থায় তিনি ‘কঠোপনিষদ্’ রচনা করেন। এই গ্রন্থটি আমার কাছে যতখানি গুরুত্বপূর্ণ, আমি যে সব গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছি, বা যাদের সম্বন্ধে আমি শুনেছি, কোনোটিই ততখানি গুরুত্বপূর্ণ নয়। পিতৃদেব এটি লিখেছিলেন আমাদেরই বাগানের বিশাল তাল গাছের পাতার ওপর। যখন পাতাগুলো তাল করে ধুয়ে নিয়ে লেখবার উপযোগী করা হোল, পিতৃদেব উপনিষদের শব্দরাজি তার ওপর লেখনী দিয়ে চিহ্নিত করলেন। আর মৃত্যুর সময় তিনি সেগুলি সর্বশ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকার রূপে আমার হাতে তুলে দিয়ে গেলেন। কেন না, এই শব্দসমষ্টি কোনো পার্থিব সম্পদ নয়। এগুলির মধ্যেই তাঁর মৃত্যুহীন সত্তা বিরাজ করছে। যা ধারণ করে রেখেছে, তাঁর অমূল্য উপলব্ধি। গোড়ার দিকে এগুলি আমার কাছে অত্যন্ত প্রিয় ছিল—এই কারণে যে এতেই তাঁর হস্তাক্ষরের নিদর্শন চিহ্নিত রয়েছে, কিন্তু এখন আমার কাছে তাঁর চিন্তা ও উপলব্ধিই অধিকতর মূল্যবান বলে মনে হয়। দীর্ঘকাল ব্যাগী অনাবৃষ্টির ফলে তালপাতাগুলি কীটদষ্ট হয়ে গেছে, সেগুলি এখন জীর্ণ ও ভঙ্গুর। কিন্তু সমগ্র উপলব্ধিটি আমি আমার হৃদয়ের মধ্যে ধারণ করে রেখেছি। যখন আমার মৃত্যু হবে—তখন এ গ্রন্থে বিবৃত চিন্তাও লুপ্ত হবে—একথা ভেবে আমি গ্রন্থটির আবার নতুন প্রতিলিপি তৈরী করতে শুরু করেছি। জীর্ণ পাণ্ডুলিপির প্রতিটি অক্ষর অবিকল এতে রক্ষিত হবে। এই নতুন প্রতিলিপিটি আমি অন্নরও সব লিপিকরদের হাতে দেব, প্রতিলিপি তৈরী করবার জন্তে। এই ভাবেই ‘কঠোপনিষদ্’ ভাবী প্রজন্মের জন্তে রক্ষিত হবে। দেশ বিদেশে এ গ্রন্থ প্রচারিত হবে। পুরাতন মূল পাণ্ডুলিপিটির পার্থক্যের এখন কঠিন, কিছু কিছু অংশ গুঁড়িয়ে ধুলোর সঙ্গে মিশে

গেছে। কিন্তু তার চিন্তারাজি অবিনশ্বর। কেন না সেগুলি নতুন প্রতিলিপিতে আবার নূতন আকার ধারণ করবে। ঠিক একই ভাবে আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা, আমাদের চিন্তাভাবনা, আমাদের মন—অবিচ্ছিন্ন, অক্ষত অবস্থায় বয়ে চলবে। বর্তমান প্রজন্মের চরিত্র বৈশিষ্ট্য আমাদের আচরণ, বাক্য ও আমাদের অনুভূতির মধ্যে দিয়ে আগামী প্রজন্মের ওপর মুদ্রিত হয়ে থাকবে, আর আমরা যখন ইহলোক ত্যাগ করে যাব তখনো আমরা আমাদের কর্ম অনুযায়ী বেঁচে থাকব। যে সব পদার্থ নানা উপাদানের সংঘাত দিয়ে তৈরী, তাদের বিনাশ অবশ্যস্বাবী। তালপাতাগুলি জীর্ণ হয়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বটে কিন্তু কঠোপনিষদ্ এখনও জীবিত।”

সুদন্ত বলে উঠল, “কিন্তু যদি পুঁথিটিতে নিবন্ধ চিন্তারশ্মির সঙ্গে সঙ্গে তালপাতাগুলিও রক্ষিত হত—তা হলে সেটা কি আরও গৌরবের হত না?”

কচ্চায়ন উত্তর দিলেন, “আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে একমত হতে পারছি না। অনুসন্ধানের সেই সুন্দর কথাগুলি কি তোমার মনে পড়ে, উপনিষদেও যার প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়? তিনি বলেছিলেন, ‘প্রেয়কে বেছে নিও না, বেছে নিও যা’ সত্য তাকে। কেন না যা অধিকতর সত্য তাই অধিকতর প্রিয়।’ তখন আমি বেছে নিয়েছিলাম প্রেয়কে—জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে আমি একটা মূল্যবান শিক্ষা পেয়েছি। এখন আমি যা সত্য তাকে বরণ করে নিয়েছি, আর তাই আমার কাছে হয়ে উঠেছে প্রিয়তর।”

সুদন্ত প্রশ্ন করে উঠল, তার কণ্ঠস্বরে বিস্ময় ফুটে উঠল, “সত্যই কি তাই?”

কচ্চায়নও তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, “সত্যিই তাই। জীবনে মৃত্যু যে প্রয়োজনীয় তাই নয়, এ শুধু জীবনের অপরিহার্য পরিণতিই নয়—কিন্তু জীবন ও মৃত্যুর এই পর্যায়ে পরমকল্যাণকরও বটে। মৃত্যুর বিভীষিকা নিয়ে আক্ষেপ করা অর্থোক্তিক, যেমন অর্থোক্তিক

নিদ্রার বিভীষিকা নিয়ে। সত্যিই মৃত্যুর মধ্যে এক ধরণের সৌন্দর্য আছে—আর এর ফলেই জীবন হয়ে ওঠে পবিত্র ও মহনীয়। একবার শুধু ভেবে দেখ—মৃত্যু না থাকলে আমাদের জীবন কি রকম হত। একঘেয়ে চিন্তা লেশহীন বিষয় লালসা ছাড়া জীবনের কোনো তাৎপর্যই আর থাকত না। মৃত্যুই জীবনকে মূল্যবান করে তোলে, যার ফলে ধর্মবোধ হয়ে ওঠে অবর্জনীয়। মৃত্যুই কেবল আমাদের জীবনের মধ্যে মূল্যবোধ সঞ্চারিত করতে বাধ্য করে। যদি মৃত্যু না থাকত তবে জগতে কোনো বীর, কোনো সাংক, কোনো বুদ্ধেরই আবির্ভাব সম্ভব হত না। অতএব মৃত্যু অবশ্যজ্ঞাবী—কিন্তু তা হলেও এর মধ্যে কোনো অশুভের স্পর্শ নেই। যারা নির্বোধ তারাই শুধু মৃত্যুর কথা চিন্তা করলেই কেঁপে ওঠে, কিন্তু যারা জ্ঞানী তাঁদের মৃত্যু সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ভয় নেই। মৃত্যু যে আমাদের শুধু শিক্ষক তাই নয়, মৃত্যুই আমাদের সকল কল্যাণের উৎস।”

কিশোর সুভৃতি

সুদন্তের ছেলেরা ক্রমশঃ বড় হয়ে উঠল—তারা উত্তরাধিকারসূত্রে পিতামহের কাছ থেকে যে সব জমিজমা পেয়েছিল, তাই দেখা-শুনা করতে লাগল। সুদন্তকে তারা বৈষয়িক কাজকর্মে সাহায্য করতে লাগল—কলে সুদন্তের হাতে তার নিজের জ্ঞে চিন্তা করবার মত অবসর থাকত। সে প্রায়ই গিরিকূটে গিয়ে বাস করত—যেখানে কচ্চায়ন থাকতেন, আর সেখানেই অধ্যয়নে ও সমাধিতে মগ্ন থাকত। তার বয়স তখন মাত্র চল্লিশের কোঠায়, কিন্তু সেই বয়সেই তার সমস্ত চুল পেকে গেছে। তাকে দেখে অনায়াসেই বেশী বয়স্ক বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক ছিল। বার্ধক্য সত্ত্বেও তার স্বাস্থ্য ও উজ্জম বিন্দুমাত্র কমেনি। যখনই পরিবারের মধ্যে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ত, গ্রামের অধিবাসীরা প্রায় সকলেই তখন তার শরণাপন্ন হত—সুদন্তও সর্বদাই ব্যক্তিগতভাবে এবং পরামর্শ দিয়ে বিপদে আপদে সাহায্য করবার জ্ঞে সর্বদাই উদগ্রীব হয়ে থাকত।

এমন সময়ে এক ঘটনা ঘটলো—মহারাজ বিদ্বিসারের দেহান্ত হল, আর তাঁর পুত্র অজাতশত্রু মগধের সিংহাসনে আরোহণ করলেন।

রাজা হয়েই অজাতশত্রু গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে তাঁর দূতদের পাঠালেন—পার্শ্ববর্তী সব করদ রাজ্যেও তাঁর দূতরা ছড়িয়ে পড়ল তাঁর প্রতি প্রজাদের কতখানি অনুরাগ আছে তা পরীক্ষা করে

দেখবার জন্মে। রাজার প্রতিনিধি, তাঁর পার্শ্ব পরিবৃত হয়ে দেহরক্ষীদের নিয়ে কুতুরঘর গ্রামেও এসে পৌঁছলেন। গ্রামে প্রবেশ করে তাঁরা যখন গ্রামের প্রধান সম্পর্কে খোঁজখবর নিচ্ছিলেন, তখন গ্রামবাসীরা তাঁদের জানাল যে, মহাস্মৃতির মৃত্যুর পর তাঁর জায়গায় আর কোন প্রধানই নিযুক্ত হয়নি। রাজ-প্রতিনিধি তখন গ্রামের সব অধিবাসীদের একত্র সম্মিলিত করে তাদের মধ্যে থেকে গ্রামের বিচার ব্যবস্থা পরিচালনা করবার জন্মে একজন প্রতিনিধি নির্বাচনের অনুরোধ জানালেন—তাঁকেই মহারাজ অজাতশত্রু মহাস্মৃতির স্থলাভিষিক্ত করবেন। কল্যাণও সংসার ত্যাগ করে ধর্মসাধনায় নিজে নিযুক্ত করেছিলেন; সুদন্তের বয়সও বেশী। এসব বিবেচনা করে রাজপ্রতিনিধি সুদন্তের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ঐ পদের জন্মে মনোনীত করলেন—তার নামও ছিল স্মৃতি। গ্রামবাসীরা পৌরুষদৃপ্ত চেহারা দেখে সানন্দে তাকে অভিনন্দন জানাতে লাগল। উচ্চস্বরে সম্মিলিতভাবে তারা বলে উঠল, “তরুণ স্মৃতিই হোক আমাদের নেতা। মহারাজ অজাতশত্রু তাঁকেই মহাস্মৃতির স্থলাভিষিক্ত করুন।”

কয়েকজন গ্রামবৃদ্ধ, যাঁরা সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা নবনিযুক্ত গ্রাম-প্রধানকে দেখে খুবই প্রীত হলেন। তাঁরা বলতে লাগলেন, “স্বয়ং মহাস্মৃতি যদি সশরীরে তাঁর যৌবনের সমস্ত তেজ ও উৎসাহ নিয়ে আমাদের সামনে আবার এসে দাঁড়াতেন, তা হলে এই তরুণ স্মৃতির থেকে তাঁকে আলাদা বলে মনে হত না। যখন মহারাজ বিশ্বিসার মহাস্মৃত্তিকে গ্রাম-প্রধান পদে নিযুক্ত করেছিলেন, তখন তাঁকে ছবছ এই তরুণ স্মৃতির মতোই দেখাচ্ছিল।”

তথাগত

একদিন এক অপরিচিত আগন্তুক কুহুরঘর গ্রামের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে সুদন্তকে পথে দেখতে পেয়ে তাঁর কাছে রাজগৃহ যাবার পথ জানতে চাইল। বুদ্ধ ব্রাহ্মণ সুদন্ত তাকে রাজধানীর পথ দেখিয়ে দিয়ে বললেন, “আমি নিজেও রাজগৃহে যেতে চাই— সেখানে তথাগত বুদ্ধ, যিনি দেব ও মানবের শাস্তা, বাস করেন। তিনিই সেই দেশক যাঁর মত আমি গ্রহণ করেছি।”

আগন্তুক তাঁকে বলল, “তবে ত ভালই হল। আমার সঙ্গেই চলুন না কেন? আমার নাম চন্দ্র, আমি দ্যুতকর। তথাগতের প্রজ্ঞার কথা আমার কাণে এসেছে, তাই আমি রাজগৃহে যাবার সংকল্প করেছি, যাতে সেখানে তাঁর উপদেশের দ্বারা উপকৃত হতে পারি।”

সুদন্ত তাঁর আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাজগৃহের পথে দ্যুতকর চন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হলেন। যাবার সময় তাঁর স্বপ্নের পরলোকগত মহাসুভূতির অন্তিম ইচ্ছার কথা তাঁর মনে পড়ল—তিনি কঠোপনিষদের তালপাতার পুঁথিখানি সঙ্গে নিলেন। রাজপথ দিয়ে চলতে চলতে চন্দ্র সুদন্তকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল, “তথাগতের প্রজ্ঞা অতি গভীর। তাঁর শিক্ষা হচ্ছে—জীবন দুঃখময়। আর আমি আমার অভিজ্ঞতা দিয়ে তাঁর এই বাণীর সত্যতা উপলব্ধি করেছি। সত্যিই দুঃখবাদই আমাদের জীবনের প্রকৃত তত্ত্ব।”

সুদন্ত তাকে বাধা দিয়ে প্রশ্ন করলেন, “হুঃখবাদ বলতে তুমি কি বলতে চাও?”



চন্দ্র উত্তর দিল, “হুঃখবাদের অর্থ হচ্ছে এই সংসার হচ্ছে হেয়, এ সংসার বাজীখেলার মত, এখানে পুরস্কারের সংখ্যা অতি অল্প,

অথচ বেশীর ভাগই শূন্য। জুয়াখেলায় জিতবার জন্ত যদি কোনো ধনী লোক খুঁকি নিয়ে সব বাজীগুলো একাই কিনে নেয়—যাতে সে সব পুরস্কারগুলো জিতে নিতে পারে, সেটাও যেমন বোকামি ছাড়া কিছু নয়, ঠিক একইভাবে আমাদের এই জীবনের মধ্যেও কোনো আকর্ষণ নেই। সে রকম জুয়াড়ী শেষ পর্যন্ত হারবেই। জীবন আগাগোড়া দেউলে—এটা যেন একটা কারবারের মত, যার থেকে খরচটাও উঠে আসে না।”

ব্রাহ্মণ সুদন্ত বললেন, “বন্ধু, তোমার কথা শুনে বুঝতে পারছি যে তোমার জীবন সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। তুমি নিশ্চয়ই একসময় জুয়াখেলায় বেশ সাফল্যের সন্ধান পেয়েছিলে, তোমার জীবন বেশ সুখেই কেটেছিল, শেষে তুমি এমন এক প্রতিদ্বন্দ্বীর দেখা পেলে, ছল চাতুরীতে সে তোমাকেও ছাড়িয়ে গেল, আর শেষ পর্যন্ত সে তোমাকে সর্বস্বান্ত করলে—এরকম যদি অনুমান করি, তা হলে কি আমার ভুল হবে?”

দূতকর উত্তর দিল, “আপনি আমার প্রকৃত অবস্থা ঠিক ঠিক ধরে ফেলেছেন। তাই আমি তথাগতের কাছে চলেছি—যিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে আমাদের এই জীবন একটা ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মতো—যাতে গোড়া থেকেই পরাজয় অবধারিত। যেখানে পুরস্কারগুলো সাজিয়ে রাখা হয় শুধু যারা মোহান্বিত তাদের প্রলুব্ধ করবার জন্তে। যখনই কোন আনাড়ী লোক আমার সঙ্গে জুয়া খেলতে আসত, আমি তাকে গোড়ার দিকে জিততে দিতুম, তার মনে সাহস জাগিয়ে তোলবার জন্তে। আমিও জীবনের জুয়াখেলায় প্রথম দিকে সাফল্যের স্বাদ পেয়েছি—কিন্তু এখন আমি বুঝতে পারছি, যে যারা গোড়ায় জেতে শেষে তারা আরও বেশী করে হারে। কিন্তু যারা প্রথম চালেই হেরে যায়, তারা ভয়ে সরে পড়ে—পরে আর তাদের হারবার সম্ভাবনা থাকে না। জীবনও একই ভাবে আমাদের বোকা বানাতে চায়। যে কীদ আমি নিজে

উদ্ভাবন করেছি বলে আমার অভিমান ছিল, সেই কাঁদে আমি নিজেও শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে গেছি।”

বয়স ও চিন্তার ভারে মুয়ে পড়া ব্রাহ্মণ স্তদন্তের দিকে ফিরে সে বলে চলল, “আপনার পলিত কেশ ও বলিচিহ্নিত মুখমণ্ডল দেখে মনে হচ্ছে যে আপনার কাছেও জীবনের মাধুর্য তিক্ত বলে মনে হয়েছে। আমার ধারণা আপনিও আমার মতই জীবন সম্বন্ধে দুঃখবাদী।”

ব্রাহ্মণের চোখে এক উজ্জ্বল দীপ্তি ফুটে উঠল, তিনি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রাজকীয় দৃপ্ত ভঙ্গীতে বলতে লাগলেন। তিনি উত্তর দিলেন, “মহাশয়, তা’ নয়—আমার অভিজ্ঞতা ঠিক আপনার মতো নয়। যৌবনকালে আমি জীবনের মাধুর্য আন্বাদন করেছি সে অনেক বছর আগেকার কথা। আমি মাঠে মাঠে আমার সঙ্গীদের সঙ্গে খেলা করে বেড়িয়েছি, আমি ভালবেসেছি, প্রতিদানে ভালবাসা পেয়েওছি। কিন্তু আমার ভালবাসা ছিল পবিত্র, বিশুদ্ধ, আর আমার মাধুর্য উপভোগের মধ্যে তিক্ততার চিহ্নমাত্রও ছিল না। কিন্তু যখন আমি জীবনের নানাবিধ দুঃখ যন্ত্রণার পরিচয় পেলাম, তখনই আমার (নতুন) অভিজ্ঞতার শুরু হল। এ সংসার দুঃখময়, আর জীবনের পরিণতি মৃত্যুতে। তখন থেকেই আমার হৃদয় দুঃখভারাক্রান্ত। কিন্তু যখন আমি ভাবি আমাদের দুঃখ থেকে নিষ্কৃতি লাভের পথ দেখাবার জন্য বুদ্ধ এই পৃথিবী বক্ষে আবিস্কৃত হয়েছেন—তখন আমার আনন্দের সীমা থাকে না। এখন আমি জেনেছি—যিনি নির্বাণের শান্তিপূর্ণ ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করেছেন তাঁর কাছে জীবনের তিক্ততাও মাধুর্যে পূর্ণ হয়ে ওঠে।”

চন্দ্র প্রশ্ন করল, “যদি জীবন তিক্ততায় পূর্ণই হয়, তাহলে আমাদের পক্ষে দুঃখ থেকে পরিত্রাণ লাভ কি করে সম্ভব?”

সুদন্ত তার উত্তরে বললেন, “আমরা যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হতে পারি না সত্যি কিন্তু আমরা যা অকুশল তা পরিহার করতে পারি, আর তার দ্বারাই নির্বাণ অবস্থায় প্রবেশ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব।”

রাজগৃহের বিহারে এসে যখন তারা হুজনে পৌঁছলেন, তখন তারা যুক্ত করে তথাগতের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে বলতে লাগলেন, “ভগবন্, আমাদের হুজনকে আপনার শিষ্যরূপে গ্রহণ করুন। আপনার উপদেশ শোনবার অনুমতি আমাদের দিন। আমরা বুদ্ধ, ধর্ম ও সম্ভ্রমের শরণ গ্রহণ করতে চাই।”

তথাগত, যিনি মানবমনের নিগূঢ় চিন্তা অনুধাবন করতে পারতেন, দ্যুতকর চন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন করলেন, “চন্দ্র! তথাগতের ধর্মমত কি তোমার জানা আছে?”

চন্দ্র বলে উঠল, “ভগবন্, তা আমার জানা আছে। তথাগতের শিক্ষা হচ্ছে এই যে—এ জীবন দুঃখময়।”

তথাগত উত্তর দিলেন, “জীবন দুঃখময় ঠিকই। কিন্তু তথাগত পৃথিবীতে অবতারণা হয়েছেন মুক্তির পথের সন্ধান দেবার জন্মে। তাঁর লক্ষ্য হচ্ছে মানবকুলকে কিভাবে দুঃখ থেকে পরিত্রাণ লাভ করতে পারা যায়—তাই শিক্ষা দেওয়া। যদি তুমি অকল্যাণ থেকে উদ্ধার লাভ করবার জন্মে ব্যাকুল হ’য়ে থাক, তাহলে দৃঢ় চিন্তে তাঁর প্রদর্শিত পথ আশ্রয় করো। স্বার্থপরতা ত্যাগ করো, আত্ম-সংযম অভ্যাস করো, আর ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে মুক্তির জন্মে সবিনয়ে রত হও।”

দ্যুতকর চন্দ্র বলে উঠল, “আমি শান্তির সন্ধানে তথাগতের পদপ্রান্তে এসেছি—কাজ করবার জন্মে নয়।”

তথাগত বললেন, “কিন্তু শান্তির সন্ধান মিলতে পারে শুধু নিরন্তর কর্ম সাধনার দ্বারাই। মরণকে জয় করতে হলে চাই আত্মবিসর্জন, আর অনলস চেষ্টার দ্বারাই শুধু শান্তি মুখ লাভ করা সম্ভব। তোমার কাছে সংসার অশুভের আকর বলে মনে হচ্ছে কারণ সে অপরকে প্রবঞ্চনা করতে চায়, শেষ পর্যন্ত তার নিজের গড়া বঞ্চনার জাল তার সর্বনাশ ডেকে আনে। তুমি যে সুখের সন্ধান করছ, তা পাপ কর্ম থেকে উদ্ধৃত বৈষয়িক ভোগসুখ। অথচ

তুমি পাপের অশুভ ছুঃখময় পরিণামকে এড়াতে চাও। যারা কখনও সংযম অভ্যাস করেনি, যারা যৌবনে জীবনের ত্রৈষ্ঠ সম্পদের সাক্ষাৎ লাভ করেনি, তাদের শেষ পৰ্যন্ত অতীতের জগ্গে দীর্ঘশ্বাস ফেলতেই হবে। এ সংসারে ছুঃখ অকল্যাণ অবশ্যই আছে—কিন্তু তুমি যে ছুঃখের কথা ভাবছ, যা নিয়ে তুমি আক্ষেপ করছ—তা কর্মের অমোঘ নিয়মেরই অবশ্যস্তাবী পরিণাম—যা সত্য ও ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত। মানুষ যেমন বীজ বপন করবে, তার ফলও তদনুযায়ী তাকে শেতেই হবে।”

তারপর তথাগত ব্রাহ্মণ সুদত্তের দিকে ফিরলেন। তিনি তাঁকে দেখেই তার চরিত্রের নির্মলতা উপলব্ধি করতে পারলেন। তাঁকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন, “হে ব্রাহ্মণ, আপনি আপনার সঙ্গীটির কাছ থেকে অনেক ভালভাবেই তথাগতের উপদেশের মর্ম উপলব্ধি করতে পেরেছেন। যিনি পরের ছুঃখ ছুঁদশাকে নিজের করে নিতে পারেন, তাঁর পক্ষে ভ্রান্ত আত্মতৃষ্টির স্বরূপ উপলব্ধি করতে বিলম্ব হয় না। তিনি সরোবর বক্ষে প্রস্ফুটিত শতদলের মত, জলের স্পর্শে যার পাপড়িগুলি আর্দ্র হয়ে ওঠে না। এ সংসারের সুখ ভোগ তাঁকে প্রলুব্ধ করতে পারে না—তাঁর আক্ষেপের কোনো হেতুই থাকবে না।”

তারপর স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে ব্রাহ্মণ দর্শনাধীরা প্রসন্ন আকৃতির দিকে তাকিয়ে বুদ্ধ বলতে লাগলেন, “আপনি ন্যায় ও সত্যের আর্থ্য মার্গ আশ্রয় করে চলেছেন, আপনার নির্মল বিশুদ্ধ কর্মামুষ্ঠানেই আনন্দ। দেহের ক্ষতস্থানের চিকিৎসা করে আরোগ্যাধান কিভাবে করতে হয় তা যেন আপনার জানা আছে, ঠিক সেইভাবেই যদি আপনি আধ্যাত্মিক ব্যাধির আরোগ্য কামনা করেন, তাহলে জনসাধারণকে বুঝতে দেওয়া চাই মৈত্রী ও করুণার বীজ থেকে কি ফল লাভ করা যেতে পারে। নিম্পাপ বিশুদ্ধ অন্তঃকরণের অপার আনন্দের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারলেই তারা এই আর্থ্য মার্গে সহজেই প্রবেশ করতে পারবে—তখন তাদের পক্ষে সেই স্থির প্রশান্ত অবস্থায়

উপনীত হতে পারা সম্ভব হবে, যা সকল সুখ ও দুঃখের অতীত, যেখানে তুচ্ছ বাসনার বিক্ষোভের চিহ্নমাত্র নেই, যা সর্ববিধ পাপ ও প্রলোভনের উর্ধ্বে। অতএব আপনি আপনার গৃহে ফিরে যান, সেখানে আপনার যেসব বন্ধু-বান্ধব আছেন, যারা সংসারের দুঃখে পীড়িত, ক্লান্ত, তাঁদের মধ্যে এই বাণী প্রচার করুন যে, কলুষ চিন্তা ও বাসনার মোহ থেকে চিত্তকে মুক্ত করতে পারলেই সংসারের দুঃখ ক্লেশ জয় করতে পারা যায়। বাক্য ও কর্মের মধ্য দিয়ে সাধুতা চারিদিকে ব্যাপ্ত করে দিন। বিশ্বজনীন করুণার প্রেরণায় উপদেশ ও সাহায্য দিয়ে সকলের সেবার জন্তে প্রস্তুত হোন। যারা রুগ্ন দুঃখার্ত তাঁদের মধ্যে গিয়ে সানন্দে বসবাস করুন—যারা লুপ্ত, তাঁদের মধ্যে লোভশূন্য হয়ে, যাদের চিত্ত ঘৃণা ও বিদ্বেষে পূর্ণ, তাঁদের মধ্যে দ্বেষমুক্ত হয়ে যেন আপনি বিচরণ করতে পারেন। এইভাবে চোখের সামনে সংপবিত্র জীবনের আদর্শ প্রত্যক্ষ করতে পারলেই তারা নির্বাণের পথে আপনার অনুসরণ করবে।”

চন্দ্র নির্বাক বিস্ময়ে ভগবান তথাগতের উপদেশ শুনতে শুনতে বলে উঠল, “সুদত্ত! আপনিই প্রকৃত সুখী, ভাগ্যবান হায়! আমি যদি এইভাবে তথাগতের উপদেশের মর্ম উপলব্ধি করে তদনুযায়ী কাজ করতে পারতাম!”

তথাগত বলতে লাগলেন, “মহাসমুদ্রের সর্বত্রই যেমন একই রকম লবণাক্ত আশ্বাদ, তথাগতের প্রচারিত দেশনায়ও একটিমাত্রই আশ্বাদ—সে আশ্বাদ নির্বাণের, মুক্তির।”

দ্যুতকর চন্দ্রের দৃষ্টি যেন উন্মীলিত হল : বুকের বাণীর উজ্জল কিরণচ্ছটায় তার হৃদয়ে দুঃখবাদের তমিস্রা দূর হয়ে গেল। সে ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠল, “ভগবন্, আমি সেই উন্নত জীবনের জন্তে উদগ্রীব হয়ে উঠেছি, সত্য ও সত্যের বিশুদ্ধ পথ যেখানে আমাদের পৌঁছে দেবে।”

তথাগত তখন বললেন, “সমুদ্রগামী লোকেরা যেমন তাদের গন্তব্য বন্দরের অভিমুখে যাবার জন্তে উদ্গ্রীব হয়ে থাকে, আমাদের জীবনও সম্যক্‌ সঙ্ঘোধি থেকে উদ্ধৃত আনন্দের অভিমুখে নিরন্তর এগিয়ে যেতে থাকে। আর সেই সঙ্ঘোধিই আমাদের সত্য ও জ্ঞানের পথ দেখিয়ে দেয় যা আমাদের নির্বাণের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।”

দ্যুতকর হাতজোড় করে বুদ্ধকে সঙ্ঘোধন করে বলতে লাগল, “আপনি কি অনুগ্রহ করে আমার সঙ্গী ব্রাহ্মণটিকে বলবেন আমাকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে যেতে? আমি তাঁর আশ্রয়ে থেকে তাঁর পরিচর্যা করব—তাঁর উপদেশ গ্রহণ করব, আর শেষ পর্যন্ত সেই নির্বাণের পরম সুখ লাভ করা আমার পক্ষেও সম্ভব হয়ে উঠবে।”

তথাগত তার উত্তরে বললেন, “সুদত্ত নিজে যা ভাল মনে করবেন তাই করবেন।”

ব্রাহ্মণ সুদত্তও চন্দ্রকে তাঁর কাজে সহকারীরূপে নিতে সম্মত হলেন। তিনি বললেন, “দার্শনিক অনুকরুদ আমাকে ধর্মপথে দীক্ষিত করেছিলেন। তাঁর মত হল—সাধু কর্মের দ্বারা অসাধু কর্ম ঢাকা পড়ে থাক ; যে তার পূর্বের ~~উদ্ধৃত~~ আচরণ ত্যাগ করে শান্ত হয়, সে শেষ পর্যন্ত মেঘমুক্ত চন্দ্রমার মতো সমগ্র বিশ্বকে উদ্ভাসিত করে তুলবে।”

যখন তথাগত দেখতে পেলেন যে উপস্থিত সকলেই মুক্তির শুভবার্তার জন্তে উদ্গ্রীব হয়ে প্রতীক্ষা করছে, তখন তিনি তাদের বিধির উপদেশ দিতে লাগলেন, তাঁর ধর্মদেশনার দ্বারা তাদের চিত্ত উদ্বুদ্ধ ও উল্লসিত করতে লাগলেন। সর্বশেষে তিনি এই বলে তাঁর ভাষণ সমাপ্ত করলেন, “এই হচ্ছে সেই ইঙ্গিত যা তোমাদের আসন্ন নির্বাণের সূচনা করে দেবে। কোনো আগন্তুক

কারণেই আর কখনো তোমাদের চিত্ত বিক্ষুব্ধ হবে না কেননা সমগ্র
 জগৎ চঞ্চল হয়ে উঠলেও তোমাদের চিত্ত স্থির শাস্ত সর্বোবরের মত
 বিরাজ করবে। তোমাদের চিত্ত থেকে আত্মার প্রতি আসক্তি
 নিমূল হয়েছে। এখন তা শুদ্ধ শাখার মতো—আর তাতে ফল
 ধারণ করবার কোনো ক্ষমতাই নেই। কিন্তু তোমাদের সহানুভূতি
 সর্বজীবের উদ্দেশ্যে প্রসারিত—যারাই দুঃখার্ত তারাই তোমাদের
 করুণার পাত্র। তোমাদের সংকর্মে প্রতি আগ্রহের বিরাম নেই।
 তোমাদের হৃদয় আজ বিস্তারিত, উন্নততর মহত্তর জীবনের চেতনায়
 উদ্ভূত। তথাগতের চিন্তা তাকে সম্পূর্ণ অধিকার করে রেখেছে।
 তোমাদের মন এখন স্বচ্ছ, নির্মল, তাতে আমাদের সমগ্র সত্তা
 আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত, উর্ধ্ব থেকে অধোলোক পর্যন্ত বিধৃত
 হয়ে রয়েছে—এখন শুধু নির্বাণই তার পরম লক্ষ্য—যার সন্ধানেই
 আমাদের এই জীবনের চরম সার্থকতা।”

